

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ইমারী



আল-জিহাদ আর্কাইভ-২০১৭

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

সূচীপত্র

একজন জঙ্গি ও তাঁর মায়ের কথোপকথন- আসমা (রাঃ) ও ইবনে যুবাইর (রাঃ).....	৩
আনসারের ফজিলত	৮
ফিকহুল জিহাদ: কাফেরদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিধান!.....	১৫
ফিকহুল জিহাদ: জিহাদ উম্মাহর প্রত্যেকের দায়িত্ব!	২১
মুসলিম জঙ্গিদের মর্যাদা.....	২৭
আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পর্কে তালেবান অফিশিয়াল সাইটে প্রকাশিত একটি বিশদ পর্যালোচনা	৩৩
প্রশ্ন: জিহাদ না করলে কি ক্ষতি হবে?.....	৪৬
জঙ্গি বলে কাকে অপবাদ (গালি) দেন। ভেবেছেন কী?.....	৫৪
দুশমনির আসল কারণ- ঈমান!	৬০
কেন আমি জঙ্গী?.....	৬৩

একজন জঙ্গি ও তাঁর মায়ের কথোপকথন- আসমা (রাঃ) ও ইবনে যুবাইর (রাঃ)

[ibn jiad](#)

Member

০৪-০১-২০১৭

আসমা বিনতু আবু বকরের ঘটনাবহুল জীবনের অনেক কথাই ইতিহাস ধরে রাখতে পারেনি। তবে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর সাথে জীবনের শেষ সাক্ষাতের সময়ে তিনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক বল ও ঈমানী দৃঢ়তার পরিচয় দেন, ইতিহাসে তা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ বিন *নু'আবিয়ার মৃত্যুর পর হিজায়, মিসর, ইরাক ও খুরাসানসহ সিরিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলের লোকেরা আবদুল্লাহকে খলীফা বলে মেনে নেয় এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। কিন্তু উমাইয়া রাজবংশ তা মেনে নিতে পারেননি। তারা তাঁকে দমনের জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে বিরাট এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাঠায়। দু'পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়, এবং তাতে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। পরিশেষে তাঁর সংগী সাথীরা বিজয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। তিনি তাঁর শেষ মুহূর্তের অনুসারীদের নিয়ে কা'বার হারাম শরীফে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে উমাইয়া সেনাবাহিনীর সাথে চূড়ান্ত সংঘর্ষের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি তার মা আসমার সাথে শেষবারের মত সাক্ষাত করতে যান। হযরত আসমা রা. তখন বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত ও অন্ধ। মাতা-পুত্রের জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপঃ

— মা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু*

— আবদুল্লাহ, ওয়া আলাইকাস সালাম। হাজ্জাজ-বাহিনীর মিনজানিক হারাম শরীফে অবস্থানরত তোমার বাহিনীর ওপর পাথর নিক্ষেপ করছে, মক্কার বাড়ী-ঘর প্রকম্পিত করে তুলছে, এমন চরম মুহূর্তে তোমার উপস্থিতি কি উদ্দেশ্যে?

— উদ্দেশ্য আমাদের সাথে পরামর্শ।

— পরামর্শ! কি বিষয়ে?

— হাজ্জাজের ভয়ে অথবা তার প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে লোকেরা আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে গেছে, এমনকি আমার সন্তান এবং আমার পরিবারের লোকেরাও আমাকে পরিত্যাগ করেছে। এখন আমার সাথে অল্প কিছু লোক আছে। তাদের ধৈর্য ও সাহসিকতা যত বেশীই হোকনা কেন, দু' এক ঘন্টার বেশী তারা

কোন মতেই টিকে থাকতে পারবে না। এদিকে উমাইয়ারা প্রস্তাব পাঠাচ্ছে, আমি যদি আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানকে খলীফা বলে স্বীকার করে নেই এবং অস্ত্র ফেলে দিয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত হই তাহলে পার্থিব সুখ-সম্পদের যা আমি চাইবো তাই তারা দেবে- এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি পরামর্শ দেন। আসমা রা. একটু উচ্চস্বরে বলেনঃ

— ব্যাপারটি একান্তই তোমার নিজস্ব। আর তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে বেশী জান। যদি তোমার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, তুমি হকের ওপর আছ এবং মানুষকে হকের দিকেই আহ*বান করছো, তাহলে তোমার পতাকাতে যারা অটল থেকে শাহাদাত বরণ করেছে, তাদের মত তুমিও অটল থাকো। আর যদি তুমি দুনিয়ার সুখ-সম্পদের প্রত্যাশী হয়ে থাক, তাহলে তুমি একজন নিকৃষ্টতম মানুষ। তুমি নিজেকে এবং তোমার লোকদেরকে ধ্বংস করেছো।

— তাহলে আজ আমি নিশ্চিতভাবে নিহত হবো।

— স্বেচ্ছায় হাজ্জাজের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং বনী উমাইয়াদের ছোকরারা তোমার মুণ্ডু নিয়ে খেলা করবে, তা থেকে যুদ্ধ করে নিহত হওয়াই উত্তম।
— আমি নিহত হতে ভয় পাচ্ছি না। আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমার হাত-পা কেটে আমাকে বিকৃত করে ফেলবে।

— নিহত হওয়ার পর মানুষের ভয়ের কিছু নেই। কারণ, জবেহ করা ছাগলের চামড়া তোলার সময় সে কষ্ট পায় না?

একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের মুখমণ্ডলের দীপ্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, ‘আমার কল্যাণময়ী মা, আপনার সুমহান মর্যাদা আরো কল্যাণময় হোক। এ সংকটময় মুহূর্তে আপনার মুখ থেকে কেবলমাত্র এ কথাগুলি শোনার জন্য আমি আপনার খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। আল্লাহ জানেন, আমি ভীত হননি, আমি দুর্বল হইনি। তিনিই সাক্ষী, আমি যে জন্য সংগ্রাম করছি, তা কোন জাগতিক সুখ সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি লোভ-লালসা ও ভালোবাসার কারণে নয়। বরং এ সংগ্রাম হারামকে হালাল ঘোষণা করার প্রতি আমার ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণেই। আপনি যা পছন্দ করেছেন, আমি এখন সে কাজেই যাচ্ছি। আমি শহীদ হলে আমার জন্য কোন দুঃখ করবেন না এবং আপনার সবকিছুই আল্লাহর হাতে সোপর্দ করবেন।’

— যদি তুমি অসত্য ও অন্যায়ের ওপর নিহত হও তাহলে আমি ব্যথিত হবো।

— আশ্মা, আপনি বিশ্বাস রাখুন, আপনার এ সন্তান কখনও অন্যায় অশ্লীল কাজ করেনি, আল্লাহর আইন লংঘন করেনি, কারো বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি, কোন

মুসলমান বা জিস্মীর ওপর যুলুম করেনি এবং আল্লাহর রিজামন্দী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন কিছু এ দুনিয়ায় তার কাছে নেই। এ কথা দ্বারা নিজেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আমার সম্পর্কে আল্লাহই বেশী ভালো জানেন। আপনার অন্তরে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি হোক- কথাগুলি শুধু এ জন্যই বলছি। জবাবে আসমা রা. বললেনঃ

— আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী জা’আলাকা আলা মা ইউহিবু ওয়া উহিবু- সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর ও আমার পছন্দনীয় কাজের ওপর তোমাকে অটল রেখেছেন। বৎস! তুমি আমার কাছে একটু এগিয়ে এসো, আমি শেষবারের মত একটু তোমার শরীরের গন্ধ শুকি এবং তোমাকে একটু স্পর্শ করি। কারণ, এটাই আমার ও তোমার ইহজীবনের শেষ সাক্ষাৎ।

আবদুল্লাহ উপুড় হয়ে তাঁর মার হাত-পা চুমুতে চুমুতে ভরে দিতে লাগলেন, আর মা তার ছেলের মাথা, মুখ ও কাঁধে নিজের নাক ও মুখ ঠেকিয়ে শুকতে ও চুমু দিতে লাগলেন এবং তাঁর শরীরে নিজের দু’টি হাতের পরশ বুলিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একথা বলতে বলতে তাঁকে ছেড়ে দিলেনঃ

— আবদুল্লাহ তুমি এ কী পরেছো?

— আশ্মা, এ তো আমার বর্ম।

— বেটা, যারা শাহাদাতের আকাজক্ষী এটা তাদের পোশাক নয়।

— আপনাকে খুশী করা ও আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি দানের উদ্দেশ্যে আমি এ পোশাক পরেছি।

— তুমি এটা খুলে ফেল। তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার সাহসিকতা ও আক্রমণের পক্ষে উচিত কাজ হবে এমনটিই। তাছাড়া এটা হবে তোমার কর্মতৎপরতা, গতি ও চলাফেরার পক্ষেও সহজতর। এ পরিবর্তে তুমি লম্বা পাজামা পর। তাহলে তোমাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হলেও তোমার সতর অপ্রকাশিত থাকবে। মায়ের কথামত আবদুল্লাহ তাঁর বর্ম খুলে পাজামা পরলেন এবং এ কথা বলতে বলতে হারাম শরীফের দিকে যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন- ‘আশ্মা, আমার জন্য দু’আ করতে ভুলবেন না।’

সাথে সাথে তাঁর মা হযরত আসমা রা. দু’টি হাত আকাশের দিকে তুলে দু’আ করলেনঃ হে আল্লাহ, রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন থাকে তখন তার জেগে জেগে দীর্ঘ ইবাদত ও উচ্চকণ্ঠে কান্নার জন্য আপনি তার ওপর রহম করুন। হে আল্লাহ, রোযা অবস্থায় মক্কা ও মদীনাতে মধ্যাহ্নকালীন ক্ষুধা ও পিপাসার জন্য তার ওপর রহম করুন। হে আল্লাহ, পিতামাতার প্রতি সদাচরণের

জন্য তার প্রতি আপনি করুণা বর্ষন করুন। হে আল্লাহ, আমি তাকে আপনারই কাছে সোপর্দ করেছি, তার জন্য আপনি যে ফায়সালা করবেন তাতেই আমি রাজী, এর বিনিময়ে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দান করুন।’

সেদিন সূর্য অস্ত যাবার আগেই হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর তাঁর মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হন। তাঁর শাহাদাতের কিছুদিনের মধ্যেই হিজরী ৭৩ সনে হযরত আসমাও রা. ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল এক শ’ বছর। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে মৃত্যুবরণ করেন। (সিয়ারু আ’লাম আন-নুবালা- ২/২৮৮)

হযরত আবদুল্লাহকে রা. হত্যার পর হাজ্জাজ তাঁর লাশকে শূলিতে লটকিয়ে রেখেছিল। তাঁর মা আসমা এলেন ছেলের লাশ দেখতে। লটকানো লাশের কাছে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, ‘এ সওয়ারীর এখনো ঘোড়া থেকে নামার সময় হলো না?’ জনতার ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে নেওয়ার জন্য হাজ্জাজ লোক পাঠায়। তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানান। সে আবারো লোক মারফত বলে পাঠায়, এবার না এলে, তাঁর চুলের গোছা ধরে টেনে আনা হবে। হযরত আসমা হাজ্জাজের ভয়ে ভীত হলেন না। তিনি গেলেন না। এবার হাজ্জাজ নিজেই এলো। তাদের দু’জনের মধ্যে নিম্নরূপ কথাবার্তা হলো। হাজ্জাজ বললোঃ

— ‘বলুন তো আমি আল্লাহর দুষমন ইবন যুবায়েরের সাথে কেমন ব্যবহার করেছি?’ আসমা বললেন, ‘তুমি তার দুনিয়া নষ্ট করেছো। আর সে তোমার পরকাল নষ্ট করেছে। আমি শুনেছি, তুমি নাকি তাকে ‘যাতুন নিতাকাইন’ তনয় বলে ঠাট্টা করেছো। আল্লাহর কসম, আমিই ‘যাতুন নিতাকাইন’। আমি একটি নিতাক দিয়ে রাসূলুল্লাহর সা. ও আবু বকরের রা. খাবার বেঁধেছি। আরেকটি নিতাক আমার কোমরেই আছে। মনে রেখ, নবী করীমের সা. কাছ থেকে আমি শুনেছি, সাকীফ বংশে একজন মিথ্যাবাদী ভণ্ড এবং একজন যালিম পয়দা হবে। মিথ্যাবাদীকে তো আগেই দেখেছি। (আল-মুখতার) আর যালিম তুমিই।’ হাজ্জাজ এ হাদীস শুনে নীরব হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিমঃ ২য় খণ্ড)।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৯৩৩>

আনসারের ফজিলত

mujahid

Senior Member

০৫-০৭-২০১৭

হাদিস নং ১:

آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار

আনাস রাযি থেকে বর্ণিত," ঈমানের নিদর্শন হলো আনসারদেরকে ভালোবাসা আর মুনাফিকের নিদর্শন হলো আনসারদেরকে ঘৃণা করা। বুখারী, মুসলিম

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী রহঃ বলেন, এ হাদিসে আনসারদেরকে ভালোবাসার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কারন তারা দ্বীনকে মর্যাদাশীল করেছেন, জান মাল দ্বারা সাহায্য করেছেন, নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন সাহাবীদেরকে।

উমদাতুল ক্বারী।

মুসলিমে এভাবে ও আছে,

«حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ، وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النِّفَاقِ»

২ নং হাদিস:

«الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ»

বারা ইবনে আযেব রাযি থেকে বর্ণিত

শুধুমাত্র মুমিনরাই আনসারদেরকে ভালোবাসে আর মুনাফিকরাই আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ রাখেন। সুতরাং যারা আনসারদেরকে ভালোবাসে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন আর যারা তাদেরকে ঘৃণা করে আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণা করেন।

বুখারী,মুসলিম।

৩ নং হাদিস:

لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ, لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِي
الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ, الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دَثَارٌ

যদি হিজরত না থাকতো তাহলে আমি আনসারদের একজন সদস্য হয়ে যেতাম।
এবং সমস্ত মানুষ যদি একটি উপত্যকা ও ঘাটি গ্রহন করতো আর আনসাররা অন্য
একটি ঘাটি ও উপত্যকা গ্রহন করতো তাহলে আমি আনসারদের ঘাটি ও
উপত্যকাই গ্রহণ করতাম। আনসাররা হচ্ছে শরীরের সাথে যে কাপড় মিশে থাকে
উহার মতো (অর্থাৎ শরীরের সাথে মিশে থাকা কাপড় যেমন শরীরের নিকটবর্তী
তারা ও আমার এতো অধিক নিকটবর্তী)

আর বাকি মানুষ উপরের কাপরের মতো (যে কাপড় শরীরে লেগে থাকে এর উপর
যে কাপড় পরিধান করা হয় ঐ কাপড় শরীরের কম নিকটবর্তী হয় বাকি লোকেরা
ও আমার এতটুকু নিকটবর্তী)

বুখারী,মুসলিম।

৪ নং হাদিস:রাসুল সাঃ আনসারদেরকে বলেছেন,

«اللَّهُمَّ أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»

হে আল্লাহ (সাক্ষী থাকো, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আনসারদের প্রতি লক্ষ্য করে)
তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

এটা তিনি ৩ বার বলেছেন। বুখারী, মুসলিম

৫ নং হাদিস:

إِنِّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»

নিশ্চয়ই তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

বুখারী, মুসলিম।

৬ নং হাদিস:রাসুল সাঃ খন্দকের দিকে বের হলেন, মুহাজির ও আনসারদের তখন
এমন দাস ছিলনা যাদেরকে দিয়ে তারা কাজ করাবেন। রাসুল যখন তাদের ক্ষুধা ও
ক্লান্তি অনুভব করলেন তখন তাদের জন্য দোয়া করলেন।

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ ... فَأَغْزِلْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

হে আল্লাহ আখিরাতের সুখ ছাড়া কোন সুখ নেই তাই তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও।

তারা উত্তরে বললেন,

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

আমরা হচ্ছি তারা যারা মুহাম্মদের হাতে বাইয়াত করেছি জিহাদ করে যাব যতদিন বেচে থাকি। বুখারী, মুসলিম।

কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে আনসারদেরকে সাহায্য করো।

কোন রেওয়ায়েতে আছে শীতের সকালে রাসুল খন্দকের দিকে বেরিয়েছেন।

কষ্ট করে দ্বীনের কাজ করার ভিত্তিতেই রাসুল সাঃ এ দুয়া করেছেন, কারন হাদিসে আছে তাদের ক্ষুধা ও কষ্ট দেখে রাসুল এ দোয়া করেছেন আমরা ও এ দোয়া পাব যদি এ কারন আমাদের মাঝে পাওয়া যায়।

৭ নং হাদিস:: রাসুল সাঃ তার ঐ অসুস্থতার সময় যেটার ফলে তিনি ইস্তেকাল করেছেন গায়ে চাদর জড়িয়ে মসজিদে গমন করলেন। মিস্রের আরোহণ করে আল্লাহর প্রশংসা ও গুনকীর্তন করার পর বললেন

«أما بعد، فإن الناس يكثرُونَ ويقلُّ الأنصار، حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئاً يضر فيه قوماً وينفع فيه آخرين، فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم

যাকপর, মানুষ বেশি হবে আর আনসার কমে যাবে এমনকি খাবারের মাঝে লবণের পরিমাণ যত অল্প মানুষের মাঝে আনসারের পরিমাণ ও এরূপ সল্পতায় এসে যাবোসুতরাং তোমাদের মধ্যে থেকে যে কেউ এমন কাজের নেতৃত্ব পারে যার মধ্যে সে এক সম্প্রদায়কে উপকৃত ও অপর সম্প্রদায়কে ক্ষতি করতে পারে সে যেন আনসারদের ভালো কাজগুলো গ্রহন করে ও ভুলগুলো ক্ষমা করে দেয়। বুখারী।

৮ নং হাদিস:

إن الأنصار كرشى وعيبيتي، وإن الناس سيكثرُونَ ويقلُّون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم

আনসাররা হচ্ছে আমার দল ও আমার বিশেষ ব্যক্তি(তাদের মাধ্যমে আমি শক্তি পাই ও নিজ কাজে তাদের উপর নির্ভর করি) অচিরেই মানুষ বেশি হবে আর আনসার কমে যাবে তাদের সুন্দর কাজগুলো গ্রহন করো ও ভুলগুলো ক্ষমা করো।বুখারী,মুসলিম।

৯ নং হাদিস:

আনাস রাযি বলেন,রাসুল সাঃ বলেছেন,

استغفر للأَنْصار হে আল্লাহ আনসারদেরকে ক্ষমা করো রাবী বলেন আমার মনে হয় তিনি এটি ও বলেছেন وَلَذَرَّايَ الْأَنْصَارِ وَلَمَوْالِي الْأَنْصَارِ ও তাদের সন্তানাদি ও আযাদকৃক দাসদের ও ক্ষমা করে দিন।

মুসলিম।মুসান্নিফে ইবনে আবি শাইবায় রাবীর সন্দেহ ব্যতীত বর্ণিত আছে ও তাদে আনসারদের নাতি পুতিদের জন্য ও দোয়ার কথা আছে।

১০ নং হাদিস:দ্বীনের জন্য যাদের সাহায্য বেশি দরকার রাসুল তাদের সাহায্য চাইতেন ও এতে বেশি খুশি হতেন।

আনাস থেকে বর্ণিত,রাসুল সাঃ পরামর্শে বসলেন যখন আবু সুফিয়ান শাম থেকে ব্যবসা শেষে ফিরছিলো,পরামর্শ চাইলেন,আবু বকর রাযি পরামর্শ দিলেন তিনি গুরুত্ব দিলেন না,উমর রাযি দিলেন গুরুত্ব দিলেন না।অতঃপর সাদ ইবনে উবাদা রাযি(আনসারদের নেতা)দাড়িয়ে বললেন, আপনি আমাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন,

وَاللّٰهُ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَخِيْضَ بِهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا

আল্লাহর শপথ আপনি যদি আমাদেরকে ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ার আদেশ দেন আমরা ঝাপিয়ে পড়বো,আর যদি আদেশ দিন বারকুল গামাদ(মক্কার অতি নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম) পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করার আদেশ দিন আমরা তাই করবো। অতঃপর রাসুল সাহাবীদের প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিলেন।(এরপর বাকি হাদিস বর্ণনা করেন)। মুসলিম।

এখানে আনসারদের পরামর্শ রাসুল এজন্য চাচ্ছিলেন ও মুহাজিরদের প্রতি ঋক্ষেপ করছিলেন না এজন্য যে, আনসারদের প্রয়োজন ছিল বেশি কারন তখন মুহাজিরদের সংখ্যা ছিলো অল্প আনসারদের বেশি আর রাসুল যখন মদিনায় এসেছিলেন তখন বাইয়াতে আকাবার সময় আনসারদের সাথে একথা হয়েছিল

যে, শত্রু আমাদের দেশে আপনাকে আক্রমণ করতে পারবে না করলে আমরা রক্ষা করবো কিন্তু মদিনার বাহিরে রাসুলকে রক্ষা করার অঙ্গীকার তাদের থেকে নেওয়া হয়নি। তাই তাদের প্রয়োজন ছিল বেশি। এজন্য রাসুল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন ও গুরুত্ব দিয়েছেন।

তারা এ কাজটি করার কারনে রাসুল খুশি হয়েছেন অবশ্যই। আর এ কাজটি আল্লাহ ও তার রাসুলের জন্যই তারা করেছেন ফলে আজও যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের ডাকে সাড়া দিবেন তারা আখিরাতে রাসুলকে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট পাবেন। কার দরকার নেই রাসুলের সন্তুষ্টির।

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ

হে ঈমানদারগণ আল্লাহ ও তার রাসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি ডাকেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করে অর্থাৎ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সূরা আনফাল। রাসুল ঐদিন ডেকেছিলেন আজও ডাকছেন কে তার আনীত দ্বীনকে সাহায্য করবে? কে তার দ্বীনের আনসার হবে।

আল্লাহ ও ডাকছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ

হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হয়ে যাও। সূরা হুফ।

وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তোমাদের উপর আবশ্যিক তাদেরকে সাহায্য করা। সূরা আনফাল।

সুতরাং আল্লাহ দুর্বলদেরকে ও আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে বলছেন আর সাহায্যের সবচেয়ে বড় সুরত হলো আশ্রয় দেওয়া ও যাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হলো তাদের জন্য ফিদা হওয়া।

আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحْشَوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ

আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে থেকেই মদীনায বাস করে ও ঈমান এনেছে অর্থাৎ আনসাররা তাদের নিকট হিজরত করে আগত মুহাজিরদেরকে

ভালোবাসে ও মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে তারা অন্তরে ক্ষোভ রাখেনা ও তারা মুহাজিরদেরকে প্রধান্য দেয় যদিও নিজেরা উপবাস থাকে।

সুরা হাশর।

এ আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যায় বুখারীতে একটি হাদিস আছে তা হলো আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত রাসুলের কাছে এক ব্যক্তি আসলো এসে বললো আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছো রাসুল তার স্ত্রীদের কাছে খাবার আছে কিনা জানতে চাইলেন তাদের কাছে খাবার না পেয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন এ ব্যক্তিকে কে খাবার খাওয়াবে তখন এক আনসারী দাড়লো রাসুল তাকে তার সাথে দিয়ে দিলেন। বাড়িতে গিয়ে তিনি স্ত্রীকে বললেন, রাসুলের মেহমান তাকে না খাইয়ে কিছু রেখে দিয়ে না। স্ত্রী বললেন, বাচ্চার খাবার ছাড়া আর খাবার নেই। সাহাবী বললেন, সে খাবার চাইলে তুমি তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিবে। এবং তুমি এসে বাতি নিভিয়ে দিবে আর আমরা উভয়ে না খেয়ে রাত্রি জাগরন করবো (মেহমান যেন বুঝতে না পারে এজন্য বাতি নিভানো তাকে খাবার দিয়ে) মহিলা তাই করলো।

সকালে মেজবান সাহাবী রাসুলের কাছে গেলেন, রাসুল বললেন, **عجب الله عز وجل أوضحك عن فلان وفلانة** আল্লাহ তায়াল্লা ঐ পুরুষ মহিলার কাজটি পছন্দ করেছেন ও তা দেখে হেসে দিয়েছেন।

এ হাদিসের মাধ্যমে বুঝা গেল মুহাজির ভাইকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে ও খাওয়ানোর ফলে আল্লাহ খুশি হন। আপনি কি চাননা আল্লাহ আপনার কাজে হাসুক!

১১ নং হাদিস:

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আনসার নামটাও আল্লাহর দেওয়া।

গাইলান ইবনে জারির বলেন আমি আনাস রাযি কে জিজ্ঞাসা করলাম আনসার নামটা সম্পর্কে আপনি কি বলেন, এটা কি আপনারা নিজেদের জন্য রেখেছেন নাকি আল্লাহ রেখেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহই আমাদেরকে এ নাম দিয়েছেন।

আপনি কি চান আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোক তাহলে আপনার জন্য বলছি

আল্লাহ বলছেন,

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

যারা প্রথম ও অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার ও যারা তাদের অনুসরণ করবে ভালোভাবে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ও তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটা মহা সফলতা।

সূরা তাওবাহ।

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ إِلَى يَوْمِ السَّاعَةِ যারা তাদের অনুসরণ করবে কেয়ামত পর্যন্ত।
জালালাইন শরীফ

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ مِّنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

কেয়ামত সংগঠিত হওয়ার পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে থাকবে তাদের মধ্য থেকে যারা তাদের অনুসরণ করবে। তাফসীরে তাবারী।(ইবনে যাসেদ থেকে বর্ণিত তাফসীরের একাংশ) অন্যান্য তাফসীরের কিতাবের সমষ্টিগত অর্থও এটাই।

সুতরাং আনসার বা মুহাজির একটা আপনাকে হতেই হবে। আনসাররা যে কাজ করেছেন সে কাজ করে কি আপনি তাদের সাথে জান্নাতে যেতে চান? তাহলে আনসার হয়ে যান। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিন। আমিন।

এ হাদিসগুলো বুখারী মুসলিম ছাড়া আরো অনেক কিতাবে আছে শব্দ সামান্য বেশকিমে উদ্দেশ্য একই। বুখারী ও মুসলিমে আছে বিধায় অন্য কিতাবের উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ

ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত ধর্ম

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬৪৬>

ফিকহুল জিহাদ: কাফেরদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিধান!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-২০-২০১৭

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ফরয যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয় অথবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। যুদ্ধবিরতি চুক্তির অর্থ হচ্ছে, উপরোক্ত দুইটির কোন একটি ছাড়াই জিহাদ বন্ধ করে দেয়া। কাজেই যুদ্ধের সামর্থ্য থাকা অবস্থায় তা জায়েয হবে না। তবে যদি মুসলমানদের মাঝে দুর্বলতা থাকে তাহলে (কাফেররা প্রস্তাব দিলে) যুদ্ধের পর্যাণ্ত শক্তি সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে পারবে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হবে ই'দাদ করে যুদ্ধের পর্যাণ্ত সামর্থ্য অর্জন করা। ই'দাদ ছেড়ে দিয়ে আরাম আয়েশে দিন কাটানোর উদ্দেশ্যে চুক্তি করা জায়েয হবে না। ই'দাদ করত পর্যাণ্ত শক্তি অর্জন হলে তখন কাফেরদেরকে অবগত করা হবে যে, 'আমরা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম যুদ্ধ না করার। এখন আমরা উক্ত চুক্তি আর বহাল রাখতে চাচ্ছি না। এখন থেকে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন চুক্তি নেই। তোমরা হয় ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হবে। অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' তবে তাদেরকে অবগত না করিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া জায়েয হবে না। কেননা, তা গান্দারী। আর ইসলাম গান্দারী হারাম করেছে।

শামসুল আইয়্যাহ সারাখসী রহ. বলেন,

وإن قالوا للمسلمين: وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون} [آل عمران: 139] . ولأن الجهاد فرض، فإنما طلبوا المودعة على أن تترك فريضة، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه المودعة، كما لو طلبوا المودعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ينبذ إليهم.

قال الله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] . وصالح رسول الله - ﷺ - أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشرين، ولأن

حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولا، ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم، فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم، فحينئذ ينبذون إليهم ويقاثلونهم، وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280]. اهـ

“তারা যদি মুসলমানদের কাছে প্রস্তাব পেশ করে যে, তোমরা আমাদের সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হও যে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না, তোমরাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; তাহলে মুসলমানদের জন্য এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে না। কেননা,

(১). আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিতও হয়ো না (যে, ভয় ও হীনমন্যতার কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করে বসবে)। প্রকৃত মু’মিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবো।” [আলে ইমরান: ১৩৯]

(২). তাছাড়া (আরেকটি কারণ হচ্ছে,) জিহাদ ফরজ। তারা চাইছে আমরা আমাদের একটি ফরয পরিত্যাগ করার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হই। অথচ এ ধরনের চুক্তিতে সম্মত হওয়া জায়েয নয়। যেমন জায়েয নয় এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যে, মুসলমানরা নামায পড়তে পারবে না, রোযা রাখতে পারবে না। তবে যদি তাদের শক্তি সামর্থ্য এত বেশি থেকে থাকে যদ্বরণ মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, তাহলে ভিন্ন কথা। তখন তাদের সাথে ততদিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া জায়েয আছে যতদিন না মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্য অর্জন হয়। শক্তি সামর্থ্য অর্জন হলে তখন তাদেরকে অবগত করিয়ে পূর্বকৃত চুক্তি রহিত করে দেবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন।) [আনফাল: ৬১]

(৩). (আরেকটি দলীল হচ্ছে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার সময় মক্কাবাসীর সাথে দশ বছরের যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করেছিলেন।

(৪). তাছাড়া (আরোও একটি কারণ হচ্ছে,) জিহাদের হাকিকত হল, প্রথমত মুসলমানদের নিজেদের শক্তি হিফায়ত করা, তারপর কাফেরদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া। যখন তারা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণ করতে অক্ষম তখন তাদের কর্তব্য হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার সামর্থ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজেদের শক্তি হিফায়ত করা। সামর্থ্য অর্জন হলে তখন তাদেরকে অবগত করিয়ে পূর্বকৃত চুক্তি রহিত করে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো। (সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তির) এই অবকাশ প্রদান, ঋণ পরিশোধে অক্ষম গরীব ব্যক্তিকে পরিশোধের সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত অবকাশ প্রদানের অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ}

(আর যদি সে অস্বচ্ছল হয় তাহলে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তার অবকাশ রয়েছে।)

[বাকারা: ২৮০]”

((শরহুস সিয়াবিল কাবীর: ১/১৯০-১৯১))

লক্ষ্যনীয়:

১. আল্লাহ তাআলার বাণী,

{وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا}

(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন।) [আনফাল: ৬১]

এখানে বলা হয়েছে, কাফেররা যদি নিজে থেকে স্বেচ্ছায় মুসলমানদেরকে চুক্তির প্রস্তাব পেশ করে তাহলে প্রয়োজন বোধ হলে মুসলমানরা তাতে সম্মত হতে পারবে। কাজেই, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মুসলমানরাই আগে আগে নিজেদের থেকে কাফেরদেরকে চুক্তির প্রস্তাব দিতে পারবে না। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন,

{فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ}

(অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চুক্তির প্রতি আহ্বান জানিও না। তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন।) [মুহাম্মাদ: ৩৫]

২. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন।) [আনফাল: ৬১]

এটি কেবল ঐ অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন মুসলমানরা দুর্বলতার কারণে জিহাদ করতে সমর্থ্য না হয়। জিহাদের সামর্থ্য থাকা অবস্থায় এই আয়াত প্রযোজ্য। কাজেই, কেউ যদি এই আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে যে, সর্বাবস্থায় চুক্তি জায়েয, তাহলে তা গলদ হবে।

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন:

فالحال التي أمر فيها بالمسألة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم. اهـ

“সন্ধির আদেশ দেয়া হয়েছে ঐ অবস্থায় যখন মুসলমানগণ সংখ্যায় থাকে অল্প আর শত্রু সংখ্যা অনেক। আর মুশরেকদেরকে কতল করা এবং আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হওয়া পর্যন্ত কিতাল করে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে যখন মুসলমানরা সংখ্যায় হয় অনেক এবং শত্রুদের উপর হয় ক্ষমতাবান।” [আহকামুল কুরআন: ৩/৯০]

৩. যুদ্ধের সামর্থ্য না থাকলে ই’দাদ-জিহাদের প্রস্তুতি ফরয। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখবে এবং ঐ সব দুশমনমকেও যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” [আনফাল: ৬০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اهـ

“সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয হবে। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে।” [মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯]

ইমাম সারাখসী রহ. তাঁর বক্তব্য-

وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280]. اهـ

“সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তির) এই অবকাশ প্রদান, ঋণ পরিশোধে অক্ষম গরীব ব্যক্তিকে পরিশোধের সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত অবকাশ প্রদানের অনুরূপ।”

তাঁর এই বক্তব্যে তিনি এ বিষয়টির প্রতিই ঈঙ্গিত করেছেন। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য না থাকলে তার থেকে ঋণের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায় না। ঋণ মাফ হয়ে যায় না। ঋণের দায়িত্ব তার উপর থেকেই যাবে। পরিশোধ তাকে করতেই হবে। তবে সামর্থ্য না থাকার কারণে আপাতত তাকে চাপ দেয়া হবে না। কিন্তু তার উপর ফরয হবে ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থ উপার্জন করা। সামর্থ্য নেই অজুহাত দেখিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই।

তদ্রূপ, জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে জিহাদের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায় না। জিহাদ মাফ হয়ে যায় না। জিহাদ ফরয থেকেই যাবে। আদায় করতেই হবে। তবে সামর্থ্য না থাকার কারণে এক্ষুনি জিহাদে নেমে যাওয়া ফরয থাকবে না। কিন্তু জিহাদ আদায় করার জন্য ই’দাদ-জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয হবে। সামর্থ্য নেই অজুহাত দেখিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই।

মোটকথা, ঋণ আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির উপর যেমন উপার্জন ফরয, জিহাদের সামর্থ্য না থাকলেও তদ্রূপ ই’দাদ ফরয।

বি.দ্র: যখন ইকদামী তথা আক্রমণাত্মক জিহাদের জন্যই ই’দাদ ফরয, তখন দিফায়ী তথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের জন্য ই’দাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকতে পারে!! কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম ভূমি কাকেরদের হাতে থাকা সত্ত্বেও, প্রতিটি ভূমিতে মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে নির্খাতিত

হতে থাকা সত্ত্বেও আলেম উলামারা বলে বেড়াচ্ছে, জিহাদ ই’দাদ কোনটাই ফরয নয়। তারা না ইকদামী জিহাদকে ফরয বলছে, না দিফায়ী জিহাদকে ফরয বলছে, না কোনটার জন্য ই’দাদকে ফরয বলছে। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৫৪৩>

ফিকহুল জিহাদ: জিহাদ উম্মাহর প্রত্যেকের দায়িত্ব!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-১৭-২০১৭

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন তাঁর দীনকে পূর্ণ করার জন্য। তাঁর দীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।”

(হুফ: ৯)

দ্বীনের বিজয় তখনই হবে যখন সারা দুনিয়ার সকল মানুষ একচ্ছত্রভাবে দ্বীনে ইসলামের আনুগত্য মেনে নেবে। আর তা দু’ভাবে হতে পারে।

এক. হয়তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবে।

দুই. কিংবা ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে নিয়ে জিযিয়া প্রদানপূর্বক মুসলমানদের অধীনস্ত হয়ে তাতে বসবাস করবে।

অতএব, কাফেরদের কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র থাকতে পারবে না। হয়তো মুসলমান হতে হবে, নয়তো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্ত হয়ে থাকতে হবে। যেসব কাফের এই দুইটির কোন একটাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন তিনি যেন তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করে যান, যতক্ষণ না তারা এ দুয়ের কোন একটা মেনে নিতে সম্মত হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا
وَأَحْصُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।)

[তাওবা: ৫]

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ

(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।)

[তাওবা: ২৯]

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন:

فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. اه.
“এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।”
[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১]

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا
الصلاة ويؤتوا الزكاة

“আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই স্বাক্ষর প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।” (সহীহ বুখারী: কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ২৫)

সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে:

عن سليمان بن بريدة عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرا على جيش أو سرية ... قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فإيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلمهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. اهـ

“হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন বাহিনী বা সারিয়্যা-ছেট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন ... তখন তাকে বলে দিতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরেকদের মোকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের আহ্বান জানাবে। এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে। (প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। আর যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। যদি তারা এতেও অসম্মতি জানায় তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।”

[সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭৩১; বাব: তা'নীকুল ইমামিল উমারা আ'লা বুয়ুস।]

অতএব, কাফেরদেরকে তাদের কুফরীতে ছেড়ে রাখার কোন অবকাশ নেই। হয়তো মুসলমান হতে হবে, নতুবা জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হতে হবে। আল্লাহ তাআলার আইন মেনে নিয়ে মুসলমানদের অধিনস্থ হয়ে থাকতে হবে। স্বতন্ত্র

পাওয়ার নিয়ে, নিজস্ব শক্তিবলে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ তাআলার এই আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর খলিফা ও প্রতিনিধিরূপে প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয় অথবা জিযিয়া দিতে বাধ্য হয়।

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك ... وإن امتنعوا منهما فحينئذ يقاتلون ... وكل مسلم في هذا خليفة رسول الله ﷺ. فقد بعث داعياً إلى ما بينا وأمر بالقتال على ذلك مع من أبى. اهـ

“ইমামের জন্য যায়েয নেই কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া প্রদানের আহ্বান ব্যতীতই ছেড়ে দেয়া, যখন তা সম্ভবপর হয়। ... তারা যদি এ উভয়টা থেকেই বিরত থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। ... প্রতিটি মুসলমান এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। কেননা, তাঁকে পাঠানো হয়েছে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাতে এবং যারা তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাঁকে আদেশ করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে। [শরুহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১২০]

অতএব, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল করা উম্মাহর প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। এটা কেবল ইমামের দায়িত্ব নয় যে, তিনি করলে তো করলেনই আর না করলে উম্মাহকে এ ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসবাদ করা হবে না। যেহেতু এটি উম্মাহর সকলের উপর ফরয, কাজেই ইমাম থাকুক বা না থাকুক, করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় উম্মাহকে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। যে-ই এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে সে-ই গোনাহগার হবে। কারো বাধার কারণে, কারো নিষেধের কারণে এ দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরে যাবে না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-সন্তান কেউ এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। এমনকি স্বয়ং ইমামুল মুসলিমীনও যদি বাধা দেন তবুও না। বরং তার বাধা উপেক্ষা করে ফরয জিহাদের দায়িত্ব আদায় করতে হবে। কারণ, কারো শরিয়ত বিরোধী বাধা নিষেধের কারণে আল্লাহ তাআলার আদেশ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. ‘আসসিয়ায়রুল কাবীর’ এ বলেন:

وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفي عاماً. اهـ

“ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নফীরে আম এর হালত তৈরী হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।”

ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন:

لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب كطاعة السيد على عبده فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفي عاماً فكذلك ها هنا. اه
“যেখানে ইমামের আদেশ পালন করতে গেলে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে হয় না, সেখানে ইমামের আনুগত্য ফরয। যেমন, গোলামের জন্য তার মনিবের আনুগত্য ফরয। নফীরে আম না হলে যেমন মনিব নিষেধ করলে জিহাদে যাবে না, ইমামের ক্ষেত্রেও তেমনি।”

[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮]

মালিকী মাযহাবের কিতাব ‘ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক’ এ বলা হয়েছে:

قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهي الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزمهم العدو وقال ابن رشد طاعة الإمام لازمة , وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين. اه
“ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে রুশদ রহ. বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যিক, যতক্ষণ না কোন গুনাহের আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।”

[ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩]

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন-

ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهي عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم... اه

“কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।”

[আল-মুহাল্লা: ৭/৩০০]

এমনকি যে ইমাম জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার বিরুদ্ধে কিতাল করে তাকে অপসারণ করা ফরয।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

فأما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضة، أو الصيام، أو الحج، أو
عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات
المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك
من واجبات الدين و محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر
الجاحد لوجوبها: فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقررة بها، وهذا
مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. اهـ

“কিতাল করা হবে প্রত্যেক এমন জামাআতের বিরুদ্ধে যারা কোন ফরয নামায, রোযা বা হজ্জ আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়; কিংবা অন্যায়ভাবে জান-মাল হরণ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা মদ, যিনা, জুয়া থেকে বিরত থাকতে বা নিজের মাহরাম মহিলাদেরকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বা আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া আরোপ করতে সম্মত না হয়; এছাড়াও দ্বীনের আবশ্যকীয় যে কোন বিধান বা যে কোন হারামকৃত বিষয়, যেগুলো অস্বীকার বা তরক করার ক্ষেত্রে কারো কোন ওয়র ধর্তব্য নয় এবং যেগুলোর ফরয হওয়া অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে- কোন জামাআত যদি সেগুলো পালন করতে বা সেসব হারাম থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। তারা যদি এসব বিধান স্বীকার করেও নেয় তবুও – আদায়ে বা বিরত থাকতে সম্মত না হলে – তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। এতে ওলামাদের কারো কোন দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।”

[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫০৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি স্পষ্ট যে, জিহাদ ইমামের একক দায়িত্ব নয়, বরং উম্মাহর সকলের দায়িত্ব। কাজেই ইমাম থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় এই ফরয দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৫১৭>

موسلم جہاد کے مرمادا

[abdullah yafur](#)

Senior Member

۱۰-۰۳-۲۰۱۹

موجاہد کے فہمات

(۱) مجاہد اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔

۱۔ موجاہد اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔

(۲) مجاہد جب میدان جنگ میں اڑ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرماتے ہیں۔

۲۔ موجاہد جب میدان جنگ میں اڑ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرماتے ہیں۔

(۳) مجاہد کا میدان جنگ میں ایک منٹ کا قیام عابد کی ستر سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔

۳۔ موجاہد جب میدان جنگ میں ایک منٹ کا قیام عابد کی ستر سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔

(۴) مجاہد کا رات کو پہرہ دینا حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر لیلة القدر کی عبادت سے افضل ہے۔

۴۔ موجاہد جب میدان جنگ میں ایک منٹ کا قیام عابد کی ستر سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔

(۵) مجاہد کا ایک دن ورات غیر مجاہد کے مہینہ کے روزوں اور رات کے قیام سے افضل ہے۔

۵۔ موجاہد جب میدان جنگ میں ایک منٹ کا قیام عابد کی ستر سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔

(۶) مجاہد کے پاؤں کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

۶۔ موجاہد جب میدان جنگ میں ایک منٹ کا قیام عابد کی ستر سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔

(۷) مجاہد کے دن گھوڑے کی پیٹھ اور رات مصلے پر گزرتی ہے۔

۶۔ مۇجاھدین دین ھوڊای بے آر رات جانی ناما جے اذیباھت ھو

(۸) مجاہد کی عبادت پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔

۷۔ مۇجاھدین ھبادت ۛر ۛپر فہرستارا ۛر ۛر ۛر

(۹) مجاہد سرحدات کو محفوظ کر کے پوری امت کے اعمال کا اجر و ثواب کماتا ہے۔

۸۔ مۇجاھد ۛنتہائی درجہ ۛر (سب کھو دیوے) مہنات کرے پورا ۛسمتہر آمالہر آجہر ۛ سوڑا ب ھاسیل کرے۔

(۱۰) مجاہد کے لئے بلوں میں کیڑے، سمندر میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے بھی دعا کرتے ہیں۔

۱۰۔ مۇجاھدین جہی ماٹیر کیرا (پوکا) سمۇدہر ماھ آسامان ۛ جمینہر ماہرہر پاخیرا ۛ دوڑا کرے ۛاکے۔

(۱۱) مجاہد کی پشت پر مظلوموں کی دعائیں ہوتی ہیں۔

۱۱۔ مۇجاھدین ۛپر مجلۇمگنہر دوڑا ۛاکے۔

(۱۲) مجاہد کیلئے رات کی تنہائی میں امت کی مائیں، بیٹیاں اور بہنیں آنسو گراتی ہیں۔

۱۲۔ مجاھدگنہر جہی شہ راترہ ۛسمتہر ما، بوٹ، ۛبہر ہونگہر ۛوہرہر پانی فہلے

(۱۳) مجاہد کی ہمت، عزم اور نظر کی بلندی پر آسمان بھی رشک کرتا ہے۔

۱۳۔ مۇجاھدین ساھس، دؤتا ۛبہر ۛر ۛر ۛر ۛر آسامان ۛ ۛر ۛر

(۱۴) مجاہد کی ثابت قدمی اور استقامت کے سامنے پہاڑ بھی گردن جھکا دیتا ہے۔

۱۴۔ مۇجاھدین دؤتا ۛ ۛستہر کاماتہر سامنہر پاھاڈ ۛ ماٹا بۇکیوے دے۔

(۱۵) مجاہد کی عاجزی و انکساری کے سامنے زمین بھی شرمندہ ہوتی ہے۔

۱۵۔ مۇجاھدین بینہر ۛ نرہی دہتہ جمین ۛ لججا بوہہر کرے۔

(۱۶) مجاہد مصائب میں الجھ کر مسکراتا ہے۔

۱۷۔ مجاہد مہم سبب (بہت) اے اور ہوا ہے۔

(۱۷) مجاہد ہر مشکل کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کرتا ہے۔

۱۸۔ مجاہد ہر مشکل کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کرتا ہے۔

(۱۸) مجاہد کو شجاعت اور بہادری بھی سلام کرتی ہے۔

۱۹۔ مجاہد کو بے باک و باہادری کا سلام کرتی ہے۔

(۱۹) مجاہد صابر ہوتا ہے۔

۲۰۔ مجاہد ہر شے پر صابر ہوتا ہے۔

(۲۰) مجاہد جفاکش ہوتا ہے۔

۲۱۔ مجاہد ہر شے پر صابر ہوتا ہے۔

(۲۱) مجاہد قناعت، زہد، سادگی کی مثال ہے۔

۲۲۔ مجاہد قناعت، زہد، سادگی کی مثال ہے۔

(۲۲) مجاہد توحید کی دعوت اپنے عمل سے دیتا ہے۔

۲۳۔ مجاہد توحید کی دعوت اپنے عمل سے دیتا ہے۔

(۲۳) مجاہد خاموش داعی ہوتا ہے۔

۲۴۔ مجاہد خاموش داعی ہوتا ہے۔

(۲۴) مجاہد کی زندگی دین کا نمونہ ہوتی ہے۔

۲۵۔ مجاہد کی زندگی دین کا نمونہ ہوتی ہے۔

(۲۵) مجاہد کی جان و مال کی قیمت جنت ہے۔

۲۶۔ مجاہد کی جان و مال کی قیمت جنت ہے۔

(۲۶) مجاہد کا زیور مجاہد کا اسلحہ ہوتا ہے۔

۲۶۔ مجاہدین کے پویشاک ہل آسالیہات (ہاتیار)

(۲۷) مجاہد کا اصل سامانِ حرب اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے۔

۲۷۔ مجاہدین کے مول سامانا ہل آاللہ تالالار یاتلر لپر پرن ایاکین راخا

(۲۸) مجاہد مسلح ہو کر بھی اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے۔

۲۸۔ مجاہد ائسے سآآآت ہولسا سآآآ و نآآلر آامآلرلر ایٹالآت کرل

(۲۹) مجاہد طاقتور ہو کر بھی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔

۲۹۔ مجاہد شآآآشالآ ہولسا سآآآ و دآرلرلر لپر ہات تولل نا

(۳۱) مجاہد مسلمانوں کے ایمان، عزت، مال اور جان کا محافظ ہوتا ہے۔

۳۱۔ مجاہد، موسلمانلرلر آیمان، ایآآت، آان ابل و ماللرلر ہیفآآت کارآ

(۳۲) مجاہد جآآتا ہے آس کے بھروسہ پر پوری امت سوتی ہے۔

۳۲۔ مجاہد آآآت آاکار لپر آرسا کرل پرا لسمت آومیلل آاکل

(۳۳) مجاہد اپنا خون پیش کر کے امت کے خون کو محفوظ کر دیتا ہے۔

۳۳۔ مجاہد نآآلر رآآآ دیلل لسمتلر رآآلر ہیفآآت کرل

(۳۴) مجاہد اشاعتِ دین کے دروازے کھولتا ہے۔

۳۴۔ مجاہد دآلن پراآلرلر دآآآ آولل دلل

(۳۵) مجاہد اپنوں کیلئے ریشم اور پروگرام کی کیلئے فولاد ہوتا ہے۔

۳۵۔ مجاہد نآآلرلر (موسلمانلرلر) آنآآ آلنآآ ابل و انولرلر (کافلرلرلر) آنآآ کرآلر ہل

(۳۶) مجاہد کو اپنے مشن اور پروگرام کی صداقت پر چڑھتے سورج سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔

۳۶۔ مجاہد نآآلر پلان پراآام پرا کرار لپر سآآآ لٹار مات ایاکین راآل

(۳۷) مجاہد کی مدد کیلئے آسان سے فرشتے اترتے ہیں۔

۳۷۔ مجاہد کل مدد کرار آنآآ آاسمان آلکل فلرلستا نآآآل ہل

(۳۸) مجاہد کی بیوی کی حرمت مسلمان پر ماں کی طرح ہے۔

۳۷۔ مجاہدین کے شہداء کا شہداء (عزت) مسلمانانہ طور پر مہر دے

(۳۹) مجاہد کی آواز پر درندے بھی جنگل خالی کر دیتے ہیں۔

۳۸۔ مجاہدین کے آگے جہاد کے لیے جان و مال کا قربان کر دے

(۴۰) مجاہد کے لیے کائنات کی ہر چیز مسخر ہو جاتی ہے۔

۳۹۔ مجاہدین کے لیے دنیاوی دولت و مال کا قربان کر دے

(۴۱) مجاہد اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔

۴۰۔ مجاہد اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے

(۴۲) مجاہد اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق ہوتا ہے۔

۴۱۔ مجاہد اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق ہوتا ہے

(۴۳) مجاہد اللہ تعالیٰ کا حقیقی فرمانبردار ہوتا ہے۔

۴۲۔ مجاہد اللہ تعالیٰ کا حقیقی فرمانبردار ہوتا ہے

(۴۴) مجاہد کی جان اور مال کا خریدار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔

۴۳۔ مجاہد اللہ تعالیٰ کا خریدار ہوتا ہے

(۴۵) مجاہد کی جان و مال کی قیمت جنت ہے۔

۴۴۔ مجاہد کی جان و مال کی قیمت جنت ہے

(۴۶) مجاہد کے استقبال کیلئے حوریں جنت سے زمین پر اترتی ہیں۔

۴۵۔ مجاہد کے استقبال کیلئے حوریں جنت سے زمین پر اترتی ہیں

(۴۷) مجاہد کے خون کے پہلے قطرے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

۴۶۔ مجاہد کے خون کے پہلے قطرے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں

“আত্মঘাতী বোমা হামলা”- সম্পর্কে তালেবান অফিশিয়াল সাইটে প্রকাশিত একটি বিশদ পর্যালোচনা

কালো পতাকা

Senior Member

১০-১২-২০১৭

শিরনামঃ “আত্মঘাতী বোমা হামলা- আসলে কি” ?
লেখকঃ ইকরিমাহ আনওয়ার, মাওলানা মুয়াবিয়া হুসাইনি

১/ ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ... যিনি আসমান ও জমিন ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুর রব্ব ... আর সলাত ও সালাম তার রসূল মুহাম্মাদ (সঃ), তার পরিবার, তার সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার সমস্ত অনুসারীদের উপর। যখন থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষাংশ ও একবিংশ শতাব্দীর ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বৈশ্বিক পরিসরে কিছু পরিভাষা নির্বিকারচিত্তে ও যাচাই-বাছাই বিহীনভাবে গৃহীত হয়ে এসেছে। এই পরিভাষাগুলোর মধ্যে “আত্মঘাতী বোমা হামলা” একটি যা সমসাময়িক বিশ্বমিডিয়াগুলোতে মুজাহিদ্দীনদের বীরত্বপূর্ণ অভিযানগুলোকে বর্ণনা করতে বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুদ্ধ কৌশল যা কাফিরদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে আসছে। বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কাফিরেরা এই কৌশলের জবাব দানে অসমর্থ। এজন্যই এর বিরুদ্ধে তাদের একমাত্র অস্ত্র হল তাদের মিডিয়াকে ব্যবহার করে সত্যকে জনগণের চোখে বিকৃতভাবে প্রকাশ করা।

ইহুদী চেরিল বার্গার্ড তার ঘৃণ্য র্যান্ড (RAND) গবেষণাপত্র “সুশীল উদার গণতান্ত্রিক ইসলাম”-এ বৈশ্বিক জিহাদের ডাককে বার্থ করার জন্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখ করেছেঃ

“মৌলবাদী চরমপন্থি ও সন্ত্রাসীদের উগ্র কর্মকাণ্ডগুলোর প্রতি কোনরকম উচ্চ ধারণা বা মুঞ্চতা প্রকাশ করা যাবে না। তাদেরকে অস্থিতিশীল প্রকৃতির এবং কাপুরুষ হিসেবে দেখাতে হবে, মন্দ স্বভাবের বীরপুরুষ হিসেবে নয়।

এই আদর্শগত নীতির উপর ভিত্তি করেই তারা মুজাহিদ্দীনদের কৃতিত্ব প্রকাশ করে

থাকে, কাজেই এই নীতির উপর ভিত্তি করে যা জানা যায় তা কখনোই বাস্তবত প্রকৃত সত্য অনুধাবন ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না। তাই, “আত্মঘাতী বোমা-হামলা” (“শহীদী অভিযান”) আসলে কি তা বোঝার জন্য আমাদের প্রয়োজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ একটি গবেষণা। আমরা ব্যবহার করব কুরআনের চিকিৎসা, সুন্নাহ এর ঔষধ এবং স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির সঞ্জীবনী শক্তি, ইনশা আল্লাহ, তাদেরকে সুস্থ করার উদ্দেশ্যে যাদের বিবেক ও অন্তর এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলাই সরল পথে একমাত্র হেদায়াতকারী।

২/ আত্মঘাতী বোমা-হামলা কি ?

“সংজ্ঞাভিত্তিক দৃষ্টিকোন থেকে আত্মঘাতী বোমা-হামলা হল যখন একজন ব্যক্তি বা একটি দল তার/তাদের লক্ষ্যবস্তুকে একটি যুদ্ধসংশ্লিষ্ট অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে নিজের/নিজেদের জীবন দেন।” এর পদ্ধতি হতে পারে নিজের দেহের সাথে বিস্ফোরক বেঁধে নেয়া, অথবা দেহসংযুক্ত কোন যন্ত্রপাতির সাথে অথবা যান-বাহনের সাথে এবং এরপর লক্ষ্যবস্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে সুবিধাজনক স্থানে বিস্ফোরণ ঘটানো। এই অভিযানগুলোতে যে ব্যক্তি বিস্ফোরণের দায়ভার গ্রহন করে, সে মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই জীবন হারায়, আর তাই এটাকে বলা হয়ে থাকে “আত্মঘাতী”।

এই যুদ্ধ-কৌশলটি কোন অভাবনীয় নব-আবিষ্কৃত আজকের দিনের কৌশল নয়, বরং ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির দ্বারা বিভিন্নভাবে এই কৌশলটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উদাহরণ হিসেবে, আধুনিক যুগে, ৯/১১ এবং ৭/৭-এর বিখ্যাত “আত্মঘাতী” অভিযানগুলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে (যেমনটা বলা হয়ে থাকে)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীরা যুদ্ধ কৌশলের অংশ হিসেবে “কামিকাজি” (kamikaze) আত্মঘাতী বোমা হামলা পরিচালনা করেছে। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে পোলিশ আর্মি আত্মঘাতী বোমা হামলা ব্যবহার করেছে বলে জানা গেছে।

সাধারণত আত্মহত্যা পারিভাষাটির ব্যবহার হয়ে থাকে যখন একজন ব্যক্তি অশান্তি/অতৃপ্তি, একাকীত্ব অথবা এরকম অন্য কোন কারণে নিজের জীবনাবসান ঘটান। আত্মহত্যাকে সাধারণত নিন্দনীয় দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে শেখায় আত্মহত্যা তখন সংঘটিত হয়, যখন মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ থেকে দূরে সরে যায়, এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেনঃ

“কিন্তু যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, (যেমনঃ কুরআনে বিশ্বাস করে না এবং এর আদেশ-নিষেধও মেনে চলে না) নিশ্চিতভাবেই, তার জন্য আছে কঠিন এক

জীবন, আর তাকে পুনরুত্থান দিবসে উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।” (২০:১২৪) কাজেই যে কেউই মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহর দীন থেকে, তার কুরআন এবং নবীর শিক্ষা থেকে, তার জন্য থাকবে এক কঠিন জীবন, তা তার বোধগম্য হোক বা না হোক। যখন একজন মুশরিক বা কাফির যে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, বা তার সাথে কাউকে শরীক করে, এবং এর ফলস্বরূপ আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্কহীন অবস্থায় থাকে, যখন তার গুনাহের প্রতিদানস্বরূপ বা অন্য কারণে কোন বিপদ-আপদ তার জীবনে আসে, তার যাওয়ার কোন জায়গা থাকে না, এবং সে এই জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পায় না। তাই সে আত্মহত্যা করে। আর যখন একজন মুসলিম আত্মহত্যা করে, তখন এর কারণ থাকে অনেকটাই একই রকম – আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরে অসন্তুষ্টি, আর দুর্বল ঈমান।

৩/ ইসলামে আত্মহত্যার বিধান

শায়খ আবদুল হাকীম (হাফিজাহুল্লাহ) লিখেছেনঃ

“আল্লাহর লানত আত্মহত্যাকারীর উপর। তার বাসস্থান জাহান্নামের আগুন। আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট। যে আত্মহত্যা করে সে এটা করে ধৈর্যহীনতা, এবং আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ে। হয় তার ঈমানে ঘাটতি আছে, অথবা ঈমান নেই। সে এমন কারণে নিজেকে হত্যা করে যে কারণে নিজের জীবন নেয়া শরীয়তে অনুমোদন নেই যেমন উদাহরণস্বরূপ, ক্রোধ, অসুস্থতা অথবা সন্ত্রাসহানি। এগুলোর কোনটার সাথেই আল্লাহর কালামকে উচ্চ করার সম্পর্ক নেই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, “আমরা যখন খায়বারে ছিলাম তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) একজন লোকের ব্যাপারে বলেছিলেন যে সে একজন জাহান্নামী, যদিও সেই লোকটি নিজেকে মুসলিম দাবি করত। যখন যুদ্ধের সময় আসল, সে বীরত্বের সাথে লড়াই করল। যখন সে খুব মারাত্মক ধরনের ক্ষত-বিক্ষত হল, মানুষজন তার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা শুরু করল (তার তাকদীর সম্পর্কে)। (কিন্তু) যখন তার ক্ষতে যন্ত্রণা হতে শুরু করল, সে নিজের ত্বন থেকে একটি তীর বের করে সেটা দিয়ে আত্মহত্যা করল। মুসলিমদের জন্য এটা খুব কষ্টকর ছিল। তারা বলল, “হে আল্লাহর রসূল (সঃ) ! আপনার কথাই সত্য প্রমাণিত হল। সেই লোকটি আত্মহত্যা করেছে।” তিনি বললেন, “যোষনা করে দাও, শুধুমাত্র বিশ্বাসীরাই জাহান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু এই ফাসেক দ্বারাও এই দীনের সাহায্য করা হয়ে থাকে।” [বুখারী, মুসলিম, আহমাদ]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূল (সঃ) বলেছেনঃ “যে কেউ নিজেকে স্বাস্রোধ করে আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে স্বাস্রোধ করা হবে।

যে তরবারি বা ছোরা দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে সেই একই শাস্তি দেয়া হবে।”

এই ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে। আত্মহত্যার নিষেধাজ্ঞার উপর আলেমদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আত্মহত্যাকারী কবিরা গুনাহতে লিপ্ত হয়েছে। যদি সে এটাকে জায়েজ মনে করে, তাহলে সে চিরকালের জন্য জাহান্নামের অগ্নিতে থাকবে। আর যদি সে এটাকে নাজায়েজ বলে জানে, তাহলে সে দীর্ঘ সময়ের জন্য জাহান্নামে থাকবে, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়। আল্লাহ সুবহানাহ্ তা’আলা বলেনঃ “... আর নিজেদেরকে হত্যা করো না (বা একে অন্যকেও নয়)। নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান। আর যে কেউই বাড়াবাড়ি বা জুলুম করতে গিয়ে এতে লিপ্ত হবে, আমরা তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করব, আর সেটা আল্লাহর জন্য সহজ।”

[৪:২৯-৩০]

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, আত্মহত্যা ইসলামে নিষিদ্ধ। এর পরবর্তীতে যা দেখা যাবে তা হল, “আত্মঘাতী বোমা-হামলা” ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা নয়, কারণ, আমরা দেখব, ইসলাম শহীদী অভিযানের প্রশংসা করে।

কাজেই শহীদী অভিযান ≠ আত্মঘাতী বোমা হামলা

এজন্যে, এখন থেকে আমরা “আত্মঘাতী বোমা-হামলা” – না বলে “শহীদী অভিযান” পারিভাষাটি ব্যবহার করবো।

৪/ শহীদী অভিযানের ব্যাপারে ইসলামের নীতি

কুরআন, সুন্নাহ এবং হক্কানী আলেম-ওলামাদের অনেক বক্তব্য থেকে শহীদী অভিযানের সমর্থন পাওয়া যায়

আল্লাহ বলেনঃ “আর মানুষের মধ্যে এমন আছে যে নিজেকে বিক্রয় করে দেয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির খোঁজে, আর আল্লাহ নিশ্চয়ই নিজের বান্দাদের ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অনুগ্রহশীল।” [২:২০৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর বলেনঃ “সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মত যে এই আয়াতটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী প্রতিটি মুজাহিদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে ... আর যখন হিশাম ইবনু ‘আমির শত্রুদলের মধ্যে বাপিয়ে পড়লেন, কিছু লোক এ ব্যাপারে আপত্তি করল। তখন উমার বিন খাত্তাব এবং আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।” [তফসীর ইবনে কাসীর ১/২১৬]

হিশাম ইবনু ‘আমির যখন শত্রুপক্ষের মধ্যে বাপ দিয়েছিলেন তখন এর ফলাফল সম্পর্কে পুরোপুরিই জানতেন যে প্রায় নিশ্চিতভাবেই তিনি নিহত হবেন, ঠিক যেমনটা শহীদী অভিযানে হয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে, উমার ইবনু খাত্তাব এবং আবু

হুয়ায়রাহ কাজটি সমর্থন করেছিলেন।

ইমাম মুসলিম তার সহীহ সনদে আবু বাক্র বিন মুসা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: “আমি আবু হুয়ায়রাহকে শত্রুর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, “আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন, “জান্নাতের দরজা তরবারির ছায়াতলে !” তখন একজন শত্রু সমর্থ লোক উঠে দাঁড়াল এবং বলল, “হে আবু মুসা ! আপনি আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে এই কথা বলতে শুনেছেন ?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ !” তখন লোকটি নিজের সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, “তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে সালাম।” তারপর নিজের তরবারির খাপটি ভেঙ্গে ফেলল এবং শত্রুর দিকে খোলা তরবারি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকল।”

বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম মুসলিমের একটি সহীহ হাদীস আছে, আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত: “মুশরিকরা (এখন আমাদের দিকে) এগিয়ে আসল, আর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: “উঠ এবং জান্নাতে প্রবেশ কর, যার প্রস্থ আসমান ও জমিনের সমান।” উমাইর বিন আল-হুতাম আল-আনসারী (রাঃ) বললেন: হে রসূলুল্লাহ (সঃ) ! জান্নাত কি আসমান ও জমিনের সমান ?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ”। উমাইর বললেন: “ভাল, ভাল !” রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “কিসে তোমাকে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করতে উদ্বুদ্ধ করল ? (অর্থাৎ “ভাল, ভাল !”)” তিনি (উমাইর) বললেন, “হে রসূলুল্লাহ (সঃ) ! অন্য কিছু নয় বরং এই ইচ্ছা যে, আমি যেন তার (জান্নাতের) অধিবাসীদের একজন হতে পারি।” তিনি (রসূলুল্লাহ (সঃ)) বললেন: “তুমি (নিশ্চয়ই) তাদের একজন।” এরপর উমাইর (রাঃ) নিজের থলি হতে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। এরপর বললেন, “যদি এই সবগুলি খেজুর খাওয়া পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি তবে তা হবে একটি দীর্ঘ জীবন।” (বর্ণনাকারী বলেন): “সে তার সাথে যত খেজুর ছিল সব ফেলে দিল এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়ে গেল।”

উপরের দুটো বর্ণনাতাই, যে সাহাবারা আক্রমণ পরিচালনা করেছেন, তারা প্রায় নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, অভিযানে তারা নিহত হবেন, কিন্তু তারা এরপরও আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাদের এই কাজগুলো শরীয়তে প্রশংসিত হয়েছে।

মুসাদ্দরাকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে আসলেন এবং বললেন: “আপনি কি বলেন, যদি আমি নিজেকে মুশরিকদের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই থাকি ? আমি কি জান্নাতে যাব ?” তিনি (রসূলুল্লাহ (সঃ)) বললেন: “হ্যাঁ।” অতঃপর লোকটি নিজেকে মুশরিকদের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করল এবং লড়াই করতে করতে নিহত হয়ে গেল। এই হাদীসটিও শহীদী অভিযানের পক্ষে একটি সুস্পষ্ট দলীল, যাতে শত্রুদের ক্ষতি করার জন্যে নিজেকে তাদের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করা হয়।

ইমাম আহমাদ (রঃ) তার মুসনাদে আহমাদে, ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা

করেছেন যে, রসূল (সঃ) বলেছেন, “আমাদের রব্ব দু’জন ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্মিত হনঃ একজন যে নিজের বিছানা ছাড়ে, নামাযের জন্য, আর একজন ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় অভিযান চালায় এবং তার সঙ্গী-সাথীরা পরাস্ত হয়েছে, আর সে বুঝতে পারে পরাজয়ে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেলে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে – কিন্তু সে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ফিরে যায় যতক্ষণ না তার রক্ত প্রবাহিত হয়। আল্লাহ বলেনঃ “আমার বান্দাকে দেখ ! সে (যুদ্ধে) ফিরে গেল, আমার কাছে যা আছে সে ব্যাপারে আশা ও ভয় রেখে, যতক্ষণ না তার রক্ত প্রবাহিত হল।”

যে ব্যক্তিটি যুদ্ধে ফিরে যায় সে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে জানে যে সে ফিরে গেলে নিহত হবে, কিন্তু আল্লাহ তার আমলকে স্বাগত জানান এবং কাজের প্রশংসা করেন। মুয়া’জ ইবন ‘আফরা (রাঃ) আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ “কি করলে আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে হাসেন ?” তিনি বললেন, “বান্দার নিজেকে বর্ম ব্যতীতই শত্রুদলের মধ্যে নিমগ্ন করা।” মুয়া’জ তখন নিজের বর্ম খুলে ফেললেন এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন।

সুবহানাঃ যার ব্যাপারে আল্লাহ হাসেন তার মর্খাদা কোন স্তরে ?

ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেছেনঃ “যখন মুসলিমদের সেনাদল পারস্যবাসীদের মুখোমুখি হল, তখন মুসলিমদের ঘোড়াগুলো পারস্যবাসীদের হাতীগুলো থেকে ভয়ে পলায়ন করছিল। মুসলিমদের একজন কাদা দিয়ে একটি হাতী তৈরি করেন এবং তার ঘোড়াকে এটার সাথে অভ্যস্ত করে তুললেন (যাতে নতুন একটি প্রাণী দেখে ঘোড়াটি ভয় পেয়ে না যায়)। পরের দিন, তার ঘোড়া হাতী থেকে পালান না, তাই তিনি নেতৃত্বদানকারী হাতীটিকে আক্রমণ করলেন। তাকে বলা হয়েছিল, “এটা নিশ্চিতভাবেই তোমার মৃত্যুর কারণ হবে।” তিনি বলেছিলেন, “এতে দুঃখের কিছু নেই, যে আমি মারা যাব এবং মুসলিমরা বিজয়ী হবে।”

এবং উপরের উল্লেখিত ছাড়াও এর মত আরো অনেক হাদীস এবং ঘটনা বর্ণিত আছে। এতে করে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে নিশ্চিতজ্ঞানের সাথে যে এই আক্রমণ তার মৃত্যুর কারণ হবে ঠিক যেভাবে শহীদী অভিযানে করা হয়ে থাকে, এবং এতে ইসলাম এবং মুসলিমদের জন্যে উল্লেখযোগ্য রকমের উপকার থাকে, তাহলে শরীয়তে এটা বিশাল পুরস্কারের যোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। শহীদী অভিযান একটি নতুন কৌশল যা পূর্বযুগে সাহাবাদের নিজেকে শত্রুদলের মধ্যে নিম্গণ করার ন্যায়, যেখানে মৃত্যুর সম্ভাবনা নিশ্চিত। এখানে একমাত্র পার্থক্য হল যে শহীদী অভিযানে, একজন মুজাহিদ নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ, আর পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাগুলোতে মুজাহিদের মৃত্যুর কারণ শত্রু। কিন্তু আলেমরা উল্লেখ করেছেন যে, এই পার্থক্য ধর্তব্য নয়, কারণ এখানে নিয়ত (আল্লাহর কালামকে উচ্চ করা) এবং শেষ

ফলাফল (মৃত্যু) দু'টো ক্ষেত্রেই এক। আর নিয়তটাই হল মূলতঃ গুরুত্বপূর্ণ।
 এছাড়াও, নিজের দলীল এ ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত করেঃ
 আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার সবচাইতে
 শক্তিশালী দলীল হল গুহার বালক এবং আসহাবে উখদূদের ঘটনাটি। ঘটনাটি
 সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে পুরো ঘটনাটি পাওয়া যাবে। আমাদের
 আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু আমরা এখানে উল্লেখ করব। ঘটনার
 সারাংশঃ পূর্বের জাতিগুলোর মধ্যে একটিতে, একজন রাজা এক বালককে তার
 ঈমান আনয়নের কারণে শাস্তি প্রদান করছিল। সে (রাজা) বালকটিকে বিভিন্ন
 উপায়ে মারার চেষ্টা করে, যেমন পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেয়া বা সমুদ্রে ডুবিয়ে
 মারা ... কিন্তু বালকটি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দু'আ করতে থাকে এবং বেঁচে
 যায়। বর্ণনা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত যা ঘটেঃ

“... সে (বালকটি) রাজাকে বললঃ “যতক্ষণ তুমি আমার কথামত কাজ না কর,
 আমাকে মারতে পারবে না।” রাজা বললঃ “সেটা কি ?” সে উত্তর দিল, “সমস্ত
 লোকজনকে একটি সমতল ভূমিতে জমায়েত কর আর আমাকে একটি (গাছের)
 গুঁড়ির সাথে বাঁধ। তারপর আমার তুন থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মধ্যখানে
 রাখ এবং বল, ‘বালকটির রবব, আল্লাহর নামে !’, এরপর আমাকে তীর মার।
 যদি তুমি এটা কর, আমাকে মেরে ফেলবে (মারতে সক্ষম হবে)।” সেইমত, রাজা
 সমস্ত লোকজনকে একটি সমতল ভূমিতে এক করলেন এবং ছেলোটিকে একটি
 (গাছের) গুঁড়ির সাথে বাঁধলেন। এরপর তুন থেকে একটি তীর নিয়ে, ধনুকের
 মধ্যখানে বসালেন এবং বললেন, “বালকটির রবব আল্লাহর নামে !” এবং তীর
 নিক্ষেপ করল। তীর বালকটির কপালের পাশে আঘাত করল। সে নিজের
 কপালের পাশে হাত রাখল এবং মৃত্যুবরণ করল। আর লোকজন বলে উঠল,
 “আমরা বালকটির রব্বের উপর ঈমান আনলাম... আমরা বালকটির রব্বের উপর
 ঈমান আনলাম

তখন রাজাকে বলা হল, “তুমি কি দেখছ যা তুমি ভয় করেছিলে ? আল্লাহর কসম !
 যা তুমি ভয় করেছিলে তাই ঘটেছে ! লোকের ঈমান এনে ফেলেছে (বালকটির
 রব্বের উপর)।” তখন রাজা প্রতিটি রাস্তার সন্ধিস্থলে পরিখার (খননের) আদেশ
 দিলেন। পরিখা খনন করার পর সেগুলোতে আগুন জালানো হল আর রাজা
 ঘোষণা করলেন, “যে কেউ নিজের ধর্ম ত্যাগে সম্মত হবে না, তাকে আগুনে ফেলে
 দাও বা আগুনে ঝাঁপ দিতে বল।” আর ঘটনাটি এরকমই ঘটেছিল, শেষ পর্যন্ত এক
 মহিলা নিজের সন্তানকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধা বোধ করলেন,
 তার বাচ্চাটি এমতাবস্থায় বলে উঠল, “হে আমার মা ! ধৈর্য ধর, কারণ তুমি সত্যের
 উপরে আছ।”

হাদীসটি থেকে এটা পরিষ্কার, যে বালকটি নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছিল

যাতে জনমানুষ ইসলাম গ্রহন করে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যায়। আর তাই, এরকম একটি আমল শরীয়ত অনুযায়ী আত্মহত্যা নয়। বরং, এটা সবচাইতে প্রশংসিত আমলগুলোর অন্যতম।

এখানে এটাও প্রমাণিত হল যে, ঠিক যেমন বালকটি ইসলামের জন্যে নিজের মৃত্যুর কারণ ঘটালো, শহীদী অভিযান পরিচালকের জন্যেও নিজের মৃত্যু ঘটানো বৈধ যদি এতে ইসলামের উল্লেখযোগ্য উপকারিতা থাকে (যা আলেম ও মুজাহিদরা নির্ণয় করবেন)। যদি কেউ দাবি করতে চায় যে বালকটি নিজের হাতে নিজের মৃত্যু ঘটায়নি, সেক্ষেত্রে আলেমরা উল্লেখ করেছেন যে একজন আত্মহত্যাকারী সে নিজেই নিজেকে হত্যা করুক বা অন্য কাউকে দিয়ে নিজেকে গুলি করাক, তার উপর একই হুকুম বর্তায়। তাই, হত্যার ধরন ধর্তব্য নয়, বরং আত্মহত্যার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর গুরুত্বপূর্ণ)। একইভাবে শাহাদাৎ সন্ধানকারীর ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, সে নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করেছে নাকি শত্রুর হাতে মরেছে যতক্ষণ তার নিয়ত সহীহ থাকে অর্থাৎ আল্লাহর কালামকে উচ্চ করা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, কাফিরদেরকে আতংকিত করা ইত্যাদি, আর আল্লাহই সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত।

এজন্যই শহীদী অভিযান বৈধ কারণ এতে নিজের জীবন উৎসর্গ করা হয়, আল্লাহর কালামকে উচ্চ করার জন্য, তার দীন প্রসারের জন্য, তার শত্রুদের আতংকিত করার জন্য এবং তার বান্দাদের (মুসলিমদের) লড়াই এর প্রতি উৎসাহিত করতে।

৫/ আলেম/ইমামদের ফতোয়া

হানাফী মাজহাবের ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসসান আশ-শায়বানী তার বই আস-সীর আল-কাবিরে বলেছেনঃ “যদি একজন ব্যক্তি ১০০০ মুশরিককে আক্রমণ করে, এবং এতে যদি সাফল্য বা শত্রুপক্ষের ক্ষতি করার ব্যাপারে আশাবাদী থাকা যায়, তাহলে এমন আক্রমণ করার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই, আর যদি না হয়, এটা অপছন্দনীয় কারণ সে মুসলিমদের কোন উপকার করা ছাড়াই নিজেকে মৃত্যুর মুখোমুখি করল। যদি কারো নিয়ত থাকে মুসলিমদেরকে তার কাজের অনুসরণে প্ররচিত করা, তাহলে এর বৈধতাকে কল্পনাপ্রসূত বলা যায় না কারণ এতে মুসলিমদের জন্যে নির্দিষ্ট কিছু দিক দিয়ে উপকার আছে। যদি তার নিয়ত থাকে শত্রুদের অতংকিত করা এবং মুসলিমদের ঈমানী তেজ জাহির করা তাহলে এর বৈধতা কল্পনাপ্রসূত নয় যদি এতে দীনের কল্যান থাকে। দীনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং অবিশ্বাসীদের দুর্বল করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা একটি মহৎ কাজ যার জন্য আল্লাহ তার কালামে তার মুমিন বান্দাদের ব্যাপারে প্রশংসা

করেছেনঃ

“নিশ্চয়ই, আল্লাহ মুমিনদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন, এর মূল্য এই যে তাদের জন্য জাহ্নাত ...” [৯:১১১] ২

মালিকি আলেমদের একজন – ইবন আল খুওয়াইজ মিকদাদ – বলেছেনঃ “এবং যে ব্যক্তি ১০০ জন বা সেনাদলের একটি ইউনিট, অথবা একদল চোর ও যোদ্ধাদের আক্রমণ করে, অথবা খাওয়ারিজদেরও তাহলে এখানে দু’টি সম্ভাবনা রয়েছেঃ “যদি সে জানে যে সে যাদেরকে আক্রমণ করছে তাদেরকে মেরে ফেলতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে এবং নিজে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে এটা ভাল। আর যদি সে জানে যে তার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু সে অনেক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারবে (শত্রুদের) অথবা মুসলিমদের উপকার হবে, তাহলে এটাও জায়েজ।” ৪

শাফিঈ মাজহাবে, ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী বলেছেনঃ “একজন লোকের অপেক্ষাকৃত বড় একটি শত্রুদলকে আক্রমণের ব্যাপারে ইজমা আছে যে, যদি এটা সাহসিকতা দেখিয়ে শত্রুকে আতঙ্কিত করার জন্য এবং মুসলিমদের শত্রুর বিরুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য বা এই প্রকৃতির কোন নিয়ত হয়, তাহলে এটা ভাল। আর যদি এটা শুধুমাত্র তাড়াহুড়া করে করা হয়, তাহলে এটা জায়েজ নয়, বিশেষ করে যদি এতে মুসলিমদের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।” ৫

হান্বালী মাজহাবে, ইবন তাইমিয়া বলেছেনঃ “চার মাজহাবের আলেমরা ঘোষণা করেছেন যে মুশরিকদের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া জায়েজ যদিও এটাই সম্ভাব্য হয় যে তারা তাকে মেরে ফেলবে, যদি এতে মুসলিমদের উপকার থাকে।” ৬

২। তাফসীর আল-কুরতুবী (৩৬৪/২)

৩। একটি ফেরকা যা ইসলাম থেকে মতপার্থক্যে বের হয়ে গেছে।

৪। তাফসীর আল-কুরতুবী (৩৬৩/২)

৫। ফাতহ-উল-বারী (৪/১৮৫-১৮৬)

৬। ফাতওয়া ইবন তাইমিয়া (২৮/৫৪০)

এই দলীলগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, শহীদী অভিযান শরীয়তী দলীল দ্বারা সমর্থিত। আর এটা আল্লাহর তা’আলার সন্তুষ্টি অর্জনের একটি বড় উপায়। যেমনটা আলেমরা উল্লেখ করেছেন, যদি উম্মাতের জন্য এতে যথেষ্ট উপকার থাকে তবে শহীদী অভিযান চালানো যেতে পারে। মুজাহিদরা অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে এই কৌশল ব্যবহার করেছেন – আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইরাক এবং সব মাজহাবের সমসাময়িক আলেমরা এটার জায়েজ হওয়ার বিধানের ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন।

৬/ সমসাময়িক ফতোয়াসমূহ

এখানে আমরা শহীদী অভিযানের ব্যাপারে কিছু সমসাময়িক আলেমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করবঃ

এ ব্যাপারে লিখিত সর্বোত্তম বইগুলোর একটি “ইসলাম এবং শহীদী অভিযান” – এর লেখক ভারত উপমহাদেশের মুফতি আবু বাশার আল-কাসমি (হাফিজাহুল্লাহ) লিখেছেনঃ

“(আসহাবে উখদূদের ঘটনা থেকে) আমরা জানতে পেরেছি যে বালকটি রাজাকে নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে নিজের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছিল। যদি সে রাজাকে নির্দেশ না দিত বা, তাকে মারার উপায় না জানাতো, তাহলে রাজার পক্ষে তাকে মারা সম্ভব ছিল না। এটা থেকে পরিস্কারভাবে এটা জানা যাচ্ছে যে অন্যের দ্বারা নিজেকে হত্যা করা অনুমোদিত, যদি এটা আল্লাহর কালামকে উচ্চ করার উদ্দেশ্যে হয়। একইভাবে, দীনের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে নিজেকে হত্যা করা অনুমোদিত – ঠিক যেমনটা আসহাবে উখদূদের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। এমনকি যে নারী ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিল, তার শিশু সন্তান তাকে সাহস যোগানোর জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় কথা বলে উঠেছিল, “মা ! সবার করুন কারণ আপনি সত্যের উপরে আছেন !” এরপর, সেই নারী আগুনে ঝাঁপ দেন এবং শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।

একইভাবে, কেউ অন্যের হাতে নিহত হলেও এতে কোন পার্থক্য নেই – উদাহরণস্বরূপ, একজন একক ব্যক্তির একটি বড় সেনাদলকে একাই আক্রমণ করা

এই সব লোকই শহীদ, প্রশংসার পাত্র... তাদের সবাই প্রশংসিত হয়েছে। এর কারণ তারা এই “আত্মঘাতী” হামলাগুলো করেছিলেন দীনের উপকার ও একে সুউচ্চ করার জন্য। এবং যা কিছুই দীনের উপকারের জন্য এবং ইসলামকে সুউচ্চ করার জন্য করা হবে, সেটা হবে উত্তম কাজ।

এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যদি কেউ দীনকে সুউচ্চ করার জন্য নিজেকে হত্যা করে, অথবা সে কাফিরদের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তারা তাকে হত্যা করে, অথবা যদি সে দীনের উপকারের জন্য অন্য কাউকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয় ... এই সবগুলোর জন্যেই একই হুকুম ... এগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা সবাই শহীদ ...”

আরেক জায়গায়, তিনি কিছু দলীল উদ্ধৃত করে লিখেছেনঃ

“এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যেইসব লোক আল্লাহর আনুগত্যে এবং জিহাদে শহীদী অভিযান চালায় এবং ফলস্বরূপ নিহত হয়, তাহলে তারা শহীদ। তাদের শাহাদাতের ব্যাপারে বা তাদের জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে সন্দেহ

পোষণ করা পুরোপুরিভাবে অন্যায়। যখন রসূলের(সঃ) জবানে তাদের শাহাদাতের সাক্ষ্য আছে, সেখানে তার উম্মাতের কারো এই অধিকার নেই যে সে এ ব্যাপারে রসূলের(সঃ) সাথে ভিন্নমত পোষণ করে।” [পৃঃ ১৬৮]

জাজিরাতুল আরবের শায়খ সুলায়মান আল-উলওয়ান (হাফিজাহুল্লাহ) লিখেছেনঃ “আর বর্তমানে আমি দেখতে পাচ্ছি, যে মুসলিমরা ইহুদীদের সাথে (সমানতালে) যুদ্ধ করতে এবং তাদের ধ্বংস করতে এবং পবিত্র ভূমি থেকে তাদের বহিষ্কার করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে বানর ও শুকরদের ভাইদের (ইহুদীদের) জন্য সবচাইতে ভাল ঔষধ হল যে আমরা শহীদী অভিযান চালাই, এবং ঈমানি জযবা বৃদ্ধির জন্য এবং অন্যান্য প্রশংসনীয় লক্ষ্যে যেমন কাফিরদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে, তাদের শারীরিক ও সম্পদসংক্লিষ্ট ক্ষতি করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করি।”

এরপর তিনি (হাফিজাহুল্লাহ) আসহাবে উখদুদের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেনঃ “এতে আল্লাহর পথে মুজাহিদদের ইহুদী, খৃস্টান ও জমীনে অনাচার সৃষ্টিকারীদের বিপক্ষে পরিচালিত শহীদী অভিযানের পক্ষে দলীল রয়েছে।”

[The Islamic Ruling on the Permissibility of Self-Sacrificial Operations: পৃঃ ৫৩-৫৪]

৭/ যুক্তিভিত্তিক বা আকলি দলীল

একজন মুসলিমের জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের দলীলই যেকোন বিষয়ে হালাল-হারাম নির্ধারণের জন্যে অন্তরের সমস্ত দ্বিধা-দন্দ দূর করার জন্যে যথেষ্ট। একটা বিষয় অনুমোদিত অথবা নিষিদ্ধ হওয়া নির্ধারিত হওয়ার জন্যে আল্লাহর কালাম এবং তার রসূলের (সঃ) সুন্নাহ এর কথাই শেষ কথা। তবে, কুরআন ও সুন্নাহ এর সাথে সামঞ্জস্যশীল যুক্তিনির্ভর দলীল দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে অনুমোদন রয়েছে। সেজন্যে এবার আমরা একটি যৌক্তিক গবেষণাধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুজাহিদদের পরিচালিত শহীদী অভিযানকে পর্যবেক্ষণ করব।

যদি বলা হয় ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার বর্তমান যুদ্ধ একতরফা (দুনিয়াবি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে), তাহলে কমই বলা হবে। একদলে আছে ৪০ এর অধিক NATO এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র এবং তাদের ভারি আকাশ, স্থল ও নৌ অস্ত্র স্থাপনা, সাম্প্রতিক নতুন গ্যাজেট, এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। তাদের আছে বি-৫২, ডেইজি কাটার (বোম্বিং যন্ত্রাংশ) এবং অ্যাপাশি (যুদ্ধবিমান), যা অল্প সময়ের মাঝেই পূর্ণাঙ্গ এক একটি জনপদ ধ্বংস করতে সক্ষম, সাথে আছে সেনাদল যাদেরকে সংখ্যায় টক্কর দেয়া দৃশ্যত অসম্ভব। তাদের হাতে আছে পরমাণু বোমা যা

মানুষের এক একটি প্রজন্ম সমূলে ধ্বংস করতে পারে। এদের নেতৃত্বে আছে এমন একটি দেশ যার সামরিক খাতে খরচ, একই গ্রহের অন্য অনেক দেশের সম্পূর্ণ বাজেটের চাইতে বেশি। এছাড়াও, এই ৪০+ দেশের সাথে আছে তাদের নির্ভরযোগ্য মিত্র, তথাকথিত “মুসলিম” দেশগুলোর মুর্তাদ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের সমস্ত সেনাদল, প্রযুক্তি ও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি।

আর অন্য দলে আছে ছাপোষা, সহজ-সরল কিছু মানুষ, যাদের হাতে কোন দেশের নিয়ন্ত্রণভার নেই। তাদের না আছে বিপুল পরিমাণ ভূমিসম্পদের উপর কর্তৃত্ব, না আছে উল্লেখযোগ্য আয়তনের কোন ভূমির রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা। তাদের অস্ত্রশস্ত্র খুবই সাধারণ – ছোটখাট আগ্নেয়াস্ত্র, ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (IED), আর সীমিত কিছু ভারী অস্ত্র। তাদের আয়ের উৎস হল তাদের দীনি ভাইদের দেয়া দান-সদকা আর যুদ্ধপ্রাপ্ত গণিমত। তাদের সংখ্যা সীমিত, তাদের বাসস্থান পাহাড়ে আর যুদ্ধকৌশল – গেরিলা।

কিন্তু আল্লাহ তাদের পক্ষে... আর বিজয় তো তাদেরই জন্য কারণ তারা সেই সত্তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় না যার হাতে আসমান ও জমিনের রাজত্ব। “কারণ যারা অবিশ্বাস করে তারা মিথ্যাকে অনুসরণ করে, আর যারা বিশ্বাসী তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে আগত সত্যকে অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।” [৪৭:৩]

আর নস্র/বিনয়ীরা হল সৌভাগ্যশালী

তারাই জমিনে কর্তৃত্বশালী হবে

কিন্তু তারা এই বিজয় অর্জন করার জন্য কি উপায় অবলম্বন করবে ?

শহীদী অভিযানের সত্যতা হল যে তা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। একজন মুজাহিদ তার শরীরে বেঁধে বা গাড়িতে করে বিস্ফোরক নিয়ে তা বিপুল সংখ্যক শত্রুর মাঝে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, আর ফলে একটি মাত্র প্রানের বদলে শত্রুর বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। যে আমেরিকানরা ২০০১ এর পর থেকে নিরীহ আফগানদের উপর শক্তি/দাপট দেখিয়ে আসছিল, তাদেরকেই এখন দেখা যায়, আলোচনায় বসার চেষ্টা করতে, এই যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে। ৯/১১ এর প্রভাব এর সাক্ষ্য দেয় ! ১৯ জন দৃঢ়চিত্ত মানুষ একটি অসাধারণ প্রচেষ্টায় ইতিহাসের স্রোতের দিক পরিবর্তনে সক্ষম হয়। এটা মূলত কাফিরদের অর্থনীতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে এবং বছরের পর বছর ধরে পরিকল্পিত তাদের পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশ স্থাপন প্রচেষ্টা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে...

এরপর ইরাকের যুদ্ধে শায়খ আবু মুসআব আল জারকাবী (রঃ) এর নেতৃত্বে শহীদী অভিযানের মাধ্যমে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। বলা হয়ে থাকে, যখন আমেরিকান সেনারা শুনতে পায় যে তারা ইরাকে যাচ্ছে আবু মুসআব আল-

কারজাবীর মুখোমুখি হতে, তাদের ভয়ে কাঁপন ধরে যায় ! একই অবস্থা হয়েছে আফগানিস্তানে মোল্লাহ দাদুল্লাহ (রঃ) এর নেতৃত্বে শহীদী অভিযানের মাধ্যমে । বাস্তবতা হল, যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফির বিশ্বে মুসলিমদের এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত কিছু নেই ।

৮/ উপসংহার

শহীদী অভিযানের বিরুদ্ধে সকল রকম মিথ্যা প্রচারণা আসলে একটি প্রহসন কারণ এর যৌক্তিকতা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত । পৃথিবীর মুসলিমদের মিডিয়া বা জনমতের দিকে তাকানো উচিত নয় বরং কোন কাজের যৌক্তিকতার মানদণ্ড নির্বাচন করতে তাকাবে শরীয়তের দিকে – উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট শরীয়ত, যা তাদের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির আলো ধারণ করে ।

আর তাই, শেষকথা হিসেবে বলা যেতে পারে, “আত্মঘাতী বোমা-হামলা” পারিভাষাটী ট্রাটিপূর্ণ । বরং “শহীদী অভিযান” হল শরীয়তে সর্বোচ্চমাত্রায় প্রশংসিত আমলগুলোর একটি, যখন তা পরিচালনা করা হয় অবস্থার প্রয়োজনভেদে, হক্কানী আলেম ও মুজাহিদদের বিবেচনা অনুযায়ী । আমরা আল্লাহর কাছে দু’আ করি যেন তিনি আমাদের সত্যকে সত্য হিসেবে দেখার ও তার উপরে চলার তৌফিক দান করেন এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে চেনার ও তা থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করেন... আর আমাদের সর্বশেষ কথা হল সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহর জন্য।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৯৬২>

প্রশ্ন: জিহাদ না করলে কি ক্ষতি হবে?

কালো পতাকা

Senior Member

১০-১৭-২০১৭

উত্তরঃ জিহাদ না করলে ব্যক্তিগত এবং জাতীয়ভাবে ভয়ংকর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। এর শাস্তি ভোগ করতে হবে দুনিয়া এবং আখিরাতের উভয় জগতোব্যক্তিগত ক্ষতি হলো, আমরা দুনিয়ার পরবর্তী যে জীবন, সে জীবনে সকলে জান্নাত লাভের আশা করি, কিন্তু জিহাদ না করলে পরকালে জান্নাত পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করেছো সোজা জান্নাতে চলে যাবে অথচ দেখে নেয়া হবে না, তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী আর কে জিহাদে ধৈর্য্য ধারণকারী। (সূরা আল ইমরান ৩ঃ১৪২)

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে মুসলমান জীবনে কোন গাজওয়া (দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ) করল না কিংবা গাজওয়া করার কোন দৃঢ় সংকল্পও করল না, এ অবস্থায় মারা গেলে, সে মুনাফিক অবস্থায় মারা গেল। (সহীহ মুসলিম) আমরা সকলেই জানি যে, মুনাফিকের অবস্থান চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “যে মুসলমান তার জীবনে কখনো কোন জিহাদে অংশ নেয়নি, না কোন মুজাহিদের জন্য জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করে দিয়েছে আর না কোন মুজাহিদ পরিবারে সহযোগিতা করেছে। ক্রিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে এক ভীষণ আযাবে নিপতিত করবেন।” (সুনানে আবু দাউদ)

এতো গেল ব্যক্তিগতভাবে জিহাদ না করার দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তির কথা। এবার দেখা যাক, জিহাদ না করলে জাতীয়ভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে কি শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اانْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, তোমাদের যখন অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে ধর। তোমরা কি আখিরাতে তুলনায় পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? আখিরাতে তুলনায় পার্থিব জীবন কত নিকৃষ্ট? (সূরা তাওবাহ ৯ঃ৩৮)

এখানে ঈমানদারদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যখন অভিযানে বের হতে বলা হয় অর্থাৎ অভিযান করা, জিহাদ করা তোমাদের প্রয়োজন হয়, ফরজ হয়ে যায়, তখন তোমরা কেন মাটি আঁকড়ে ধর? মাটি আঁকড়ে ধরার অর্থ হলো দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা, ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা, জিহাদে বের না হওয়ার পথে এগুলো বাঁধা হয়ে যাওয়া। ঈমানদাররা যদি এ উপকরণ গুলো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে তবে তার জন্য আল্লাহ শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন-

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিবেন এবং অন্য একটি জাতিকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন, যাদের তোমরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরা তাওবাহ ৯ঃ৩৯) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, জিহাদ না করলে ঈমানদারদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দেবেন এবং অন্য একটি জাতিকে চাপিয়ে দেবেন। চাপিয়ে দেয়ার অর্থ হলো, তারা যেমন খুশি তেমন শাসন করবে, জুলুম-নির্যাতন চালাবে। আর তাদের কোন ক্ষতি করা যাবে না।

জিহাদ ফরজ হওয়ার পর তা আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারি। এ ইতিহাস ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জন্মস্থান বোখারার ইতিহাস। লেলিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় যখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসে সে সময় বোখারা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র ছিল। সারা বিশ্ব থেকে ছাত্ররা সেখানে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেত। একমাত্র বোখারায় অসংখ্য এমন মাদ্রাসা ছিল, যেসব মাদ্রাসায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার পর্যন্ত ছাত্র পড়াশোনা করত। বুখারার কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা এত বিশাল ছিল যে, একমাত্র সহীহ বুখারীর দারস নিত একসাথে ৪০০০ হাজার ছাত্র বসে। কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় গিয়ে পারম্পারিক দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়ে মধ্য এশিয়ার মুসলিম

দেশগুলোর দিকে নজর দেয়। তারা সামরিক হামলা করে একের পর এক ভূখন্ড দখল করে নেয়। এক পর্যায়ে তারা অবরোধ করে বোখারা।

বোখারা যখন অবরোধ, বোখারার মাদরাসার ছাত্ররা তখন ওস্তাদদের কাছে এ দুর্দিনে তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চায়। এক শ্রেণীর ওস্তাদ সেদিন বলেছিল, দেখ লেলিন যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করছে তাতে ইসলামেরই সাম্য, এতো ওমরেরই সাম্য। লেলিনের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। আর এক শ্রেণীর ওস্তাদ সেদিন ছাত্রদের বলেছিল লেলিনের বিশাল বাহিনী, অনেক শক্তি। তাদের সাথে যুদ্ধ করে আমরা পারব না, আমাদের কিছু নেই, প্রশিক্ষণ নেই, অস্ত্র নেই। তোমরা সবাই দোয়া কর, বিপদ-আপদ দূর করার যত দোয়া জানা আছে, সেগুলো পড়, বুখারী খতম কর, আল্লাহ এ বিপদ দূর করে দেবেন। সে সময় বোখারার হাজার হাজার আলেম ছিল, লক্ষ লক্ষ কুরআন-হাদীসের কপি ছিল। ফরজ থেকে শুরুর করে অতি ক্ষুদ্র আমলগুলোও সেখানে বেশী বেশী হতো। কিন্তু মাত্র একটি আমলের অভাব ছিল সেখানে। হাজার হাজার আলেম ছিল ঠিকই কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানের সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়া যা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন সে আমল তাদের ছিল না। আল্লাহর নির্দেশ যথা সম্ভব সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখা- সেখানে বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাই শত্রু যখন আক্রমণোদ্ধাত তখন তারা এ অযুহাত পেশ করেছেন যে আমাদের ট্রেনিং নেই, অস্ত্র নেই। এ গাফলতির চরম মামুল দিতে হয়েছিল। বোখারাবাসীদের অল্পদিনেই লাল ফৌজ বোখারা দখল করে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেয়। তারা নির্বিচারে আলেমদের হত্যা করে। তাদের এই পাইকারী হত্যাকাণ্ড থেকে সেইসব আলেমও রেহায় পায় নি যারা বলেছিল, লেলিন ইসলামের সাম্যই প্রতিষ্ঠা করছে। বোখারার কেন্দ্রীয় মাদরাসা চত্বরে হাটু সমান রক্ত জমে গিয়েছিল। দিনব্যাপী আলেমদের পাইকারীহারে হত্যার পর বিকেল বেলা কমুনিষ্ট সৈন্যরা শহরের সাধারণ মানুষদের বোখারার বাজারে সমবেত করে। তাদের সামনে একটা লাশের খাটিয়া এনে রাখা হয়। তাতে একখন্ড কাঠ চাদর মুড়ি দিয়ে ঢেকে রাখা ছিল। সৈন্যরা সাধারণ মানুষদের জিজ্ঞেস করছিল, জান এখানে কার লাশ, সাধারণ মানুষ অজ্ঞতা প্রকাশ করলে তারা উপহাস করে বলছিল, এখানে তোমাদের আল্লাহ শুয়ে আছে (নাউজুবিল্লাহ)। সে আমাদের হাতে নিহত হয়েছে, তোমাদের এখন জানাজা পড়তে হবে। অসহায় মানুষগুলোকে এ কাটখন্ডের জানাজা আদায়ে বাধ্য করা হয়। অবশেষে সারা শহর ঘুরিয়ে এনে সে খাটিয়া শহরের বাইরে ফেলে দিয়ে কমিউনিষ্ট অফিসাররা দস্তভরে ঘোষণা করে আজ থেকে বোখারা আল্লাহ মুক্ত। তাকে বোখারা থেকে বহিঃস্থার করা হল (নাউজুবিল্লাহ)।

বোখারার নির্মম নির্ধাতন

এরপর বোখারার সাধারণ মুসলমানদের ওপর শুরু হয় নির্মম নির্ধাতন। মসজিদ মাদরাসা তালাবদ্ধ করে দেয়া হয়। আযান, সলাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত নিষিদ্ধ করা হয়। কুরআন পড়া আরবী শেখা, মুসলিম পরিচয় দেয়া, দাঁড়ি রাখা সবকিছু নিষিদ্ধ করা হয়। মুসলিম নাম পাল্টে রাশিয়ান নাম রাখা হয় কেউ মারা গেলে লাশ ইলেকট্রিক চুল্লিতে জালিয়ে ছাই করে দেয়া হত, লাশ দাফন করার পর্যন্ত অনুমতি ছিল না। এমনি নির্ধাতন চলে প্রায় ৭০ বছর। এরপর বোখারাসহ মধ্য এশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন হয়ে গেলে বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা সেখানে যাতায়াত শুরু করে। এসব মুসলমানদের কাছে স্থানীয়রা মাসালা জিজ্ঞেস করে। তারা জিজ্ঞেস করত, ভাই মাসালা জানি না, প্রস্তাব করলে অযু ভাঙ্গে কিনা, ভাই কুরআন কত খন্ডে নাখিল হয়েছে?

ইমাম বোখারীর দেশের মানুষ জিজ্ঞেস করছিল, প্রস্তাব করলে অযু ভাঙ্গে কিনা! কুরআন কত খন্ড! একদা যেখানে লক্ষ লক্ষ কুরআন হাদীসের কপি ছিল তারা এই এমন প্রশ্ন করত। বোখারার ইতিহাস পড়ে যানা যায়, লাল ফৌজ পরবর্তী ছয় মাস বোখারার যেসব ঘরে বসাবস করত সেই সব ঘরের কোণের চুল্লিতে শুধু কোরআন হাদীস জালিয়ে ঘর গরম করে রেখেছিল।

আফগানিস্তানে রাশিয়ান আক্রমণ শুরুতে রাশিয়া মধ্য এশিয়ার মুসলিম সৈন্যদের প্রেরণ করেছিল। আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে তা প্রতিহত করতে যুদ্ধ করতে হবে বলে তাদের প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল এই হামলা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে, মনে মনে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, অতীত ইতিহাস তাদের স্মরণ হয়ে যায়। তার গোপনে বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপের সাথে আতাত গড়ে তোলে। তারা মুজাহিদদের কাছে এই প্রস্তাব পাঠায় যে, তোমরা আমাদের মূল্যবান অস্ত্রগুলো নিয়ে নাও, বিনিময়ে একটা মাত্র জিনিস চাই, তা হলো একখন্ড কুরআন মাজীদ। জীবনে এই জিনিস আমরা চোখে দেখিনি।

মুজাহিদরা যখন তাদের হাতে একখন্ড কুরআন মাজীদ তোলে দিত তারা তা নিয়ে বুক চাপড়াত আর কেঁদে কেঁদে বলত, এই সেই কুরআন মাজীদ যা আমাদের জীবনে চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি!! ইমাম বুখারীর দেশের মানুষ চোখের পানি ফেলে বুক চাপড়ে কাঁদছেন, জীবনে কুরআন মাজীদ দেখার সৌভাগ্য হয়নি বলে। তাদের ইসলাম থেকে দীর্ঘ সত্তর বছর আগে এই বোখারার চিত্র কি ছিল? আলেম ওলামা, কুরআন, হাদীস, মসজিদ, মাদ্রাসায় ভরপুর ছিল এই ঐতিহাসিক নগরী। শুধু একটি ফরয, (শত্রুর বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করা দরকার) তারা আমল করেনি বলে আল্লাহ তাদের মর্মান্তিক শাস্তি প্রদান করেন। এমন শাস্তি প্রদান করেন যে,

একটি সমৃদ্ধ মুসলিম জাতি মুসলিম নামটি পর্যন্ত রাখার অধিকার পায়নি। আল্লাহ রাশিয়ানদের তাদের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দেন, তারা মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের সত্তর বছর যেমন খুশি সেভাবে জুলুম নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে। এই ছিল পূর্বে উল্লেখিত সূরা তাওবার ৩৯ নং আয়াতের বাস্তব উদাহরণ।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ذُلًّا

যখন তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। (আবু দউদ, বায়হাকি, তাবরানী) এই হলো জিহাদ ত্যাগ করার জাতীয় ক্ষতি।

প্রশ্নঃ সবচেয়ে বড় আমল কোনটি?

উত্তরঃ সবচেয়ে বড় আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেবনা যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। (সূরা সফ ৬১ঃ১০-১১)

অর্থাৎ ঈমান আনার পর উত্তম আমল হলো, আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা। সাহাবীরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? উত্তরে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছিলেন-

سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ الْجِهَادُ

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা। তারপর সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর

রাস্তায় জিহাদ করা। (সহীহ বুখারী)এ উত্তম আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

অর্থঃ যদি তোমরা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ কর কিংবা মরে যাও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য থাকবে অজস্র ক্ষমা ও রহমত। লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করে তার থেকে এটি অধিকতর উত্তম। (সূরা আলে ইমরান ৩ঃ১৫৭)

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে যারা শহীদ হবে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتٌّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْقَرْعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيَرْزُقُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُسْقَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

আল্লাহর নিকট শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে।

১. শরীরের প্রথম ফোটা রক্ত জমিনে পড়ার আগে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার আগেই জান্নাতে তার অবস্থান দেখিয়ে দেয়া হয়।
২. কবরের আযাব থেকে তাকে হেফাজত করা হয়।
৩. কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে তাকে হেফাজতে রাখা হয়।
৪. তার মাথার উপর সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। উহার খন্ডিত একটি ইয়াকুত দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সেসব থেকে উত্তম।
৫. তার বিবাহ হবে সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট বাহান্তর জন হরের সাথে।
৬. তার নিকটতম ৭০ জন আত্মীয়ের জন্য (যারা জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়েছে) সুপারিশ কবুল করা হবে। (তিরমিযি ১ম খন্ড)

সুবহানাল্লাহ! এমন মর্যাদা আর কোন আমলে পাওয়া যাবে। মূলত জিহাদের আমলে যত কষ্ট যত ত্যাগ আর যত বিপদ-আপদের মোকাবেলা করতে হয় অন্য কোন আমলে করতে হয় না, তাই জিহাদের আমলের মর্যাদা-পুরস্কারও সবচেয়ে বেশী। অল্প সময় জিহাদের আমল করে যে সাওয়াব পাওয়া যায় অন্য কোন আমলে

পাওয়া যায় না। জিহাদের আমলের বিনিময়ে নাজাত ও জাম্মাত লাভের সুসংবাদ ও নিশ্চয়তা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু অন্য কোন আমলে জাম্মাত ও মুক্তি লাভের এমন কোন নিশ্চয়তা ঘোষিত হয়নি। বরং আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমারা কি ধারণা করেছ জাম্মাতে চলে যাবে, অথচ দেখে নেয়া হবেনা, তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল (জিহাদের পথে) ছিলো। (সূরা আলে ইমরান ৩ঃ১৪২)

অর্থাৎ জাম্মাতে যাবার আগে আল্লাহ দেখে নেবেন কে কে জিহাদ করেছে। অন্যান্য আমল করলেও জিহাদ না করলে জাম্মাত পাওয়ার আশা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

যে সকল লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত বা বিজয়ী হবে, তাদেরকে আমি বড় পুরস্কার দেব। (সূরা নিসা ৪ঃ৭৪)

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ

নিশ্চয়ই জাম্মাত তরবারীর ছায়ার তলে। (সহীহ বুখারী ১ম খন্ড)

মায়াজ বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, ‘যে সামান্য সময়ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তার জন্য জাম্মাত অবধারিত।’ (আবু দাউদ ১ম খন্ড)

ভিন্ন এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ‘আল্লাহর রাস্তায় এক রাত্রি পাহারা দেয়া, ঘরে বসে এক হাজার রাত্রি সাওম রাখা ও সলাত আদায় থেকে উত্তম। যার এক বছর হলো ৩৬০ দিনে আর একদিন হলো ১০০০ বছরের সমান। (ইবনে মাজাহ ২য় খন্ড)

আল্লাহর রাস্তায় এক রাত্রি পাহাড়া দেয়া, দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

ঐ চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহাড়া দিয়েছে। (সুনানে তিরমিযি)

যার দু'টি পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলায় ধূসরিত হয়েছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (সহীহ বুখারী)

জিহাদরত অবস্থায় অন্যান্য আমলের ফযিলতও বেড়ে যায়। যেমন বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে একদিন সাওম রাখবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের দূরত্ব করে দিবেন। (সহীহ বুখারী ১ম খন্ড)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ

উত্তম আমল সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে। জনৈক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা জিহাদের সমান মর্যাদা রাখে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, জিহাদের সমান মর্যাদার কোন আমল আমি খুঁজে পাচ্ছি না। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৯৯৮>

জঙ্গি বলে কাকে অপবাদ (গালি) দেন। ভেবেছেন কী?

[maruful](#)

Junior Member

১২-০৬-২০১৭

জঙ্গি শব্দের পরিভাষা ব্যবহার করে আমরা যাদেরকে সন্ত্রাসী (terrorist) অপবাদ দেই আসলে উনারা কী জঙ্গি? মানে উনারা কী সন্ত্রাসী, নাকি এরা জঙ্গি নামের দ্বীনের মুজাহিদ? আমরা যাদেরকে জঙ্গি বলে মিথ্যা অপবাদ দেই মূলত উনারাই হলেন মানবতার আসল কর্তৃপক্ষ। উনারাই হলেন জাতির আসল কাণ্ডারি। প্রশ্ন জাগতে পারে মনে তাহলে উনারাদেরকে জঙ্গি (terrorist) বলা হয় কেন? ভাই এই জঙ্গিরা কিন্তু আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার জন্যই এমনটা করে থাকেন। অবাক হচ্ছেন?

না, অবাক হওয়ার কোন কারণ নাই এটাই চরম বাস্তব। আসুন সেই বাস্তবতাটা কী একটু তালাশ করে দেখি।

তাহলে শুরুতে আমাদেরকে জঙ্গি শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে এবং এর পারিভাষা ব্যবহার করে কেমনে এর অপব্যবহার করা হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু জানতে হবে।

দেখুন, "জঙ্গি" এই শব্দটা হচ্ছে ফার্সি। তার মূল ধাতু হচ্ছে "জঙ্গ"। যার বাংলা অর্থ যুদ্ধ। আর যারা যুদ্ধ করেন তাদেরকেই বলে জঙ্গি অর্থাৎ বাংলায় মুক্তিযোদ্ধা। বাংলা ভাষায় কোন জাতি যদি অন্যের পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের দেশ,দেশের জনগণ, সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অধিকার আদায়, জনগণের মাল-সম্পদ, ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য পরদেশীয় আগ্রাসনবাদীদের বিরুদ্ধে কোন সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলে সেটাকে বলে মুক্তিযুদ্ধ। যেমন আমরা আমাদের এই সোনার বাংলাকে পাক-হানাদার বাহিনীর জুলুম-নির্যাতন থেকে উদ্ধার করার জন্য কৃষক-শ্রমিক, ধনী-গরীব, জুয়ান-বুড়ো সবাই একসাথে মিলে একটা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলাম। সেটাকে আমরা বলে মুক্তিযুদ্ধ। আর যারা এই মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন তাদেরকে আমরা বলি মুক্তিবাহিনী বা যুদ্ধা। তেমনিভাবে আরবীতে 'আল-জুহুদু' বা 'আল-ইজতেহাদু' মাসদার থেকে একটি শব্দ নির্গত হয় যাকে বলে জিহাদ। আর যারা এই জিহাদের মহান কাজটা সম্পাদন করেন তাদেরকে বলে মুজাহিদ। তেমনিভাবে ফার্সি ভাষায় একটি ধাতু আছে "জঙ্গিযু"। অর্থাৎ যারা দীন ক্বায়েমের জন্য আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, যুদ্ধ করে ফার্সীতে তাদেরকে

বলে জঙ্গি। তাহলে তো ভাল কথা। আমরা যারা না বুঝে জঙ্গিদেরকে জড়ি বলে অপবাদ দেই মূলত তারা সন্ত্রাস নয়। তারা মূলত দ্বীনের মুজাহিদ! তারপরও তাদেরকে জঙ্গি বলে গালি দেওয়া হয় কেন? এখানেও একটু মাথা খাটাতে হবে। আর তাহল হলো, এই অপব্যবহার বা পরিভাষা আসল কোথেকে? দেখুন, এখানেও ইয়াহুদি, খ্রিস্টানদের গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ইসলামে জিহাদের অনুমোদন করা হয়েছে। এই ভিত্তিতে ইসলামকে সন্ত্রাসী চেতনার ধারক বলে অপব্যখ্যা করছে। বস্তুত ইসলামের জিহাদনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকাই এর মূল কারণ কিংবা তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই এরূপ অপব্যখ্যার আশ্রয় নিয়ে ইসলামকে বিশ্বের দরবারে হেয় করে তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

বস্তুত মুসলমানদের আদর্শচ্যুত করে নিজেদের কৃষ্টি ও কালচারের অনুসারী বানিয়ে ফেলা পাশ্চাত্যের ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানচক্রের আজীবনের লালিত স্বপ্ন। ওরা গবেষণা করে দেখেছে, মুসলিম মুজাহিদদেরকে যদি মুজাহিদ বলে গালি দেওয়া হয় তাহলে এটা গালিতে ব্যবহার হবে না। বরং মুসলমানরা মুজাহিদ শব্দের তাৎপর্য বুঝে জিহাদের প্রতি আরো ঝুকে পড়বে। তাই তারা এই জঙ্গি শব্দটাকে terror এর পারিভাষিক অর্থ জঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করেছে। terror অর্থ ত্রাস। আরা যারা ত্রাস সৃষ্টি করে তারাই হলো terrorist। আর যারা এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে সেই কাজটাকে বলে terrorism। মূলত এখানে ইয়াহুদি, বৈদ্যমানেরা জঙ্গি শব্দকে terrorism অর্থে ব্যবহার করেছে। এবার আপনারাই একটু চিন্তা করুন জঙ্গি বলে আমরা কাদেরকে গালি দিচ্ছি ?

আসুন জেনে নেই এই জঙ্গিদের কর্মপন্থা কী।

দেখুন, এই জঙ্গিরা (মুজাহিদরা) আল্লাহর নির্দেশেই জঙ্গি কর্মকাণ্ড করে থাকেন।

দেখুননা তাদের মহান কাজগুলো। এই ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যেমন দেখুন,

এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেনঃ

"হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।

সূরা :তাওবাঃ ৭৩।

"আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো, তবে কারো প্রতি সীমালঙ্ঘন করোনা। নিশ্চই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না"।

সূরাঃ বাকারা ১৯০

"আর যেখানে পাও তাদের হত্যা করো এবং যেখানে থেকে তোমাদের বের করে দিয়েছে তোমরা ও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও ফিতনা হত্যার চেয়ে গুরুতর। আর তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তাদের হত্যা করবে। এটাই কাফিরদের পরিণাম"।

সূরাঃ বাকারা ১৯১।

"যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না"। সূরা তওবা

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)"। সূরা বাকারা ১৯৪

"আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় অসহায় নর-নারি ও শিশুদের জন্য জিহাদ করছো না? যারা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ জালেম শাসকের দেশ থেকে বের করে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট থেকে কাউকে অভিভাবক নিযুক্ত করো"।

সূরাঃ নিসা ৭৬

কাট, ধরো, মারো, লড়াই করো, জিহাদ করো, সংশোধন করো, ফিতনা দূর করো, গর্দানে মারো, বেধে ফেলো, বের করে দাও এভাবে আল্লাহ সমস্ত কোরআন জুড়ে সাড়ে ছয়'শোরও বেশি জিহাদের আয়াত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছেন।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, আল্লাহ তায়াল্লা কেন এমন নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবো, প্রতিটা আয়াতেই কিন্তু আল্লাহ এর কারণও বর্ণনা করেছেন। যেমন দেখুন, সূরা বাকারার ১৯৪ নং আয়াতে আল্লাহ, বলেছেন

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়"।

উপরোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় আল্লাহ জিহাদ করার কথা বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিতনা দূর হয়। আমরা লক্ষ্য করলে এ ও দেখতে পাই যে, ইসরাইল, আমেরিকা, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন, ফ্রান্স ইত্যাদি

জালিমেরা আফগান,ইরাক,লেবানন,সিরিয়া,আফ্রিকা, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেকনিয়া,বসনিয়া, ইত্যাদি মুসলিম দেশে আগ্রাসন চালিয়ে ফাসাদ সৃষ্টি করেছে।আর সেই ফাসাদকে দূর করার জন্যই তো আল্লাহ কোরআনে এমন বিধান জারি করেছেন।সেই বিধানকেই কায়ম করতে অর্থাৎ জুলুম,ফাসাদ দূর করার জন্য শহিদ ড.আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ শহিদ উসামা, শায়খ মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর, শায়খ আইমান আল-জাওয়াহিরী হাফিয়াহুল্লাহ তায়াল প্রমুখ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। এরদ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জঙ্গি নামের দ্বীনের মুজাহিদ্দীনগণ আল্লাহর যমীন থেকে ফিৎনা-ফাসাদ দূর করার জন্যই জঙ্গি হয়েছেন। এভাবে বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলেও সমান হয়। যেমন: নাস্তিক্যবাদী শাতিমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, কোরআন, সাহাবায়ে কেরাম এবং ইসলামের অন্যান্য বিধান নিয়ে কটাক্ষ করতো না, তাহলে এদেশীয় আল-কায়দা তথা (aqis) এর সাথীরা ধারালো চাপাতি হাতে নিয়ে তাদের কুপিয়ে কুপিয়ে জাহান্নামের টিকিট দিত না। শাতিমরা ইসলাম অবমাননা করে ফাসাদ সৃষ্টি করেছে ফলে আল-কায়দার মুজাহিদ্দরা তা চাপাতি থেরাপি দ্বারা দূর করার চেষ্টা করেছে।আর এখানেও দেখা যায় কোরআনের সেই বিধান খাপেখাপ মিলে গেছে।

তাছাড়া খুদ কোরআনেই আল্লাহ তায়ালার আরো সুন্দরভাবে এর কারণ বর্ণনা - করেছেনঃ

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ (সন্ত্রাসবাদ) সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে, আমরাই তো সংশোধনকারী। জেনে রেখো ওরাই সন্ত্রাসবাদ (ফাসাদ) কায়মকারী,কিন্তু তারা তা বুঝে না।

সূরা বাকারা ১৩

উপরোক্ত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী বুঝা যায় পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছে, যারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই ধরাদামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে বেড়ায়।অথচ যখন তাদেরকে বলা হয় সন্ত্রাসী করো না, তখন তারা বলে, আমরা সন্ত্রাসী করছি? আরে না না, আমরাই তো মনবতার কাণ্ডারি। আসুন দেখে নেই তাদের সন্ত্রাসী কর্ম-কান্ডগুলো, যা করেও তারা অস্বীকার করে।

" নিঃসন্দেহে ফির'আউন তার দেশে উদ্ধৃত (পরাক্রমশালী) হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল।সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করতো আর নারীদেরকে জীবিত (দাসী) বানিয়ে রাখতো। নিঃসন্দেহে সে ছিলো অশান্তি সৃষ্টকারী।

সূরা কাছাছ-৫

"ফির'আউন বলল:... অবশ্যই আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো, আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শুলে চড়াব..."
সূরা ত্ব-হা, ৭১

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, ভাই এটা তো সেই কতশত বছর আগের ফির'আউনের কথা। কিন্তু বর্তমান যুগে তালেবান, আল-কায়েদারা জিহাদ করছে কেন? হ্যাঁ, এটাই বলতে চাইছিলাম।

বর্তমান মানবতার দাবিদার, আমেরিকা, ইসরাইল, চীন, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, ফ্রান্স, ইতালি ও অন্যান্য জাতিমণ্ডল কী মুসলমানদের মা-বোনদের নির্যাতন করছে না? তারা কী মুসলমানদের কচি কচি শিশুদেরকে জবাই করছে না? তারা কী মুসলমানদের নিরাপদ ভূমিতে আত্মসন চালিয়ে সেগুলোকে বিরান ভূমিতে পরিণত করছে না? অবশ্যই তারা এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে পৃথিবীর বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করছে। তাই এইসব ত্রাস দূর করার জন্যই আল্লাহ বলেছেন,

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়"।

অপর আরেকটি আয়াতে আছে,

"আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে "তোমরা ও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো, তবে কারো প্রতি সীমালঙ্ঘন করোনা। এবং যেখানে থেকে তোমাদের বের করে দিয়েছে তোমরা ও তাদেরকে সেখানে থেকে বের করে দাও। ফিতনা হত্যার চেয়ে গুরুতর। আর তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তাদের হত্যা করবে। এটাই কাফিরদের পরিণাম"।

বাকারা ১৯১

এখন যদি আপনি আমেরিকা, ইসরাইল, ইন্ডিয়া, চীন, রাশিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তোমরা, মুসলমানদের উপর জুলুম করছো, কেন তাদের ভূমি দখল করে তাদের স্ত্রী-পুত্রদের হত্যা করে ফাসাদ সৃষ্টি করছো? তারা বলবে, কই, আমরা তো মুসলমানদের উপর কোন জুলুম করছি না, তাদের ভূমি দখল করে তাদের স্ত্রী-পুত্রদের হত্যা করেও কোন ফাসাদ সৃষ্টি করছি না। বরং আমরা তো সন্ত্রাস দমন করছি। আরে আমরাই তো মানবতার কাভারি। যেমনিভাবে ফের'আউন বলেছিল, তোমরা ছাড়া আমাকে, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। সূরা গাফির, ৪০:২৬।

আবার "ফির'আউন বলল, আমি যা বুঝি তাই তোমাদেরকে বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথ দেখাই"

সূরা গাফির, ৪০:২৯।

এবার আপনারাই বলুন ফির'আউন কী মানুষকে ভাল পথ দেখিয়েছিল? ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি তৎকালীন সময়ে তার চাইতে বড় জালিম আর কেউ ছিল না। তারপরও সে দাবী করে বসেছিল সে নাকি সন্তোষ দমনকারী। তদ্রূপ এইযোগেও আমেরিকা বা অন্যান্য সন্তোষীরা এমনটা দাবী করছে, যা ধোঁকাবাজি বৈ ছাড়া আর কিছু না।

আরেকটা আয়াতেও এরূপ আছেঃ-

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ (সন্তোষবাদ) সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে, আমরাই তো সংশোধনকারী।

জেনে রেখো ওরাই সন্তোষবাদ (ফাসাদ) কায়মকারী, কিন্তু তারা তা বুঝে না।
সূরা বাকারা ১৩

ফির'আউনের কবল থেকে বনী ইসরাইলকে উদ্ধার করার জন্য হযরত মুসা (আ.সা) যেমন ফির'আউনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, তেমনি আমাদের প্রিয় নবীও তৎকালীন মক্কার মুশরিকদের জুলুম থেকে সে সময়কার দুর্বল মুসলমানদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। আর এটাকেই সহজ অর্থে জিহাদ বলে। আর এভাবেই যুগে যুগে নির্ধারিত মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য তলোয়ার উঠিয়েছিলেন, হযরত আবু-বকর, উমর, আলী, উসমান, খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারিক বিন যিয়াদ, মোহাম্মদ বিন কাসিম। এভাবে নুরুদ্দিন জঙ্গি, সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী, সুলতান মাহমুদ গজনবী, শহিদ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ উসামা বিন লাদেন, শায়খ শহিদ ইমাম আওলাকি, শহিদ খাতাব, মুসআব যাকরাকায়ী, মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর, মোল্লা আখতার রাহিঃ শায়খ আইমান আল-জাওয়াহিরী, আসেম ওমর, শায়খ মাকদাসি, শায়খ মুহাইসীনি হাফিয়াহু মুল্লাহ প্রমুখ। এবার আমার প্রশ্ন হলো আপনারা যদি আজকের জঙ্গিদের (মুজাহিদদের) থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে উপর দিকে যান, তাহলে এই ধারাবাহিকতা ঠিক রাসূল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে। তাহলে আপনি আজকের মুজাহিদদেরকে জঙ্গি বলে গালি দিয়ে আপনার আমার প্রিয় নবীকেও যে গালি দিচ্ছেন। তা কী ভেবে দেখেছেন কখনো?

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৩৬৫>

দুশমনির আসল কারণ- ঈমান!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-১০-২০১৭

আসহাবে উখদুদের ঘটনা আমরা শুনেছি। ঈমান আনার কারণে ঐ কাফেররা ঈমানদারদেরকে পুড়িয়ে মেরেছিল। আল্লাহ তাআলা সূরা বুরুজ্জে একে এভাবে চিত্রায়িত করেছেন-

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوُفُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (৭)

“আমি শপথ করছি বিশালাকায় গ্রহ নক্ষত্র (ও তাদের কক্ষপথ) বিশিষ্ট আকাশের। শপথ করছি সেই (কেয়ামত) দিবসের যার আগমনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। শপথ করছি সেই প্রতিশ্রুত (দিনের অসংখ্য অগণিত) প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের, আরো শপথ করছি (সেই লোমহর্ষক ভয়াবহ দৃশ্যের) যা সেদিন (এই সকল প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে) পেশ করা হবে। আল্লাহর মার গর্তওয়ালাদের উপর। ইন্ধনপূর্ণ আগুনাওয়ালাদের উপর। যখন তারা এর পাশে বসা ছিল এবং মুমিনদের সাথে তারা যা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল।” (সূরা বুরুজ্জ: ১-৭)

তারা কেন তাদেরকে এমন নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারল? তাদের অপরাধ কি ছিল? আল্লাহ তাআলা এর উত্তর দিয়েছেন-

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (৯)

“(আসলে এই জালেমরা এদের কাছ থেকে ঈমানের প্রতিশোধ নিচ্ছিল মাত্র।) মহাপরাক্রমশালী, স্বীয় স্বত্তায় প্রশংসিত এবং আকাশ ও নভোমণ্ডলীর রাজাধিরাজ সম্রাট আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনা ছাড়া এদের শাস্তি দেয়ার আর কোন কারণই ছিল না। (সর্বোপরি সেই) আল্লাহ (জালেম ও মজলুমসহ) সকলের কার্যাবলী (যথাযথ) অবলোকন করছেন।” (সূরা বুরুজ্জ: ৮-৯)

আল্লাহ তাআলা অমোঘ সত্যটি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের কোন অপরাধ নেই। অপরাধ এটাই যে, তারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল। আল্লাহ তাআলা আর কোন কারণ বর্ণনা করেননি। কারণ একটাই বলেছেন। আর তা হল- ঈমান। মুমিনদের সাথে কাফেরদের দুশমনির আসল কারণ- ঈমান। অতএব, যার মাঝে ঈমান আছে, তার সাথেই কাফেরদের দুশমনি। সে ভাল হোক কি মন্দ, নেককার হোক কি বদকার- সর্বাবস্থায় কাফেররা তাকে দুশমন গণ্য করে। যতক্ষণ তাকে এই ঈমান থেকে সরাতে না পারবে, ততক্ষণ তাকে দুশমনই গণ্য করবে। তার উপর অত্যাচারের সিস্টম রোলার চালাবে। এই চিরাচরিত সত্যটি আল্লাহ তাআলা অন্য দু' খানা আয়াতে তুলে ধরেছেন-

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

“তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরাতে পারে- যদি তারা তা করতে সক্ষম হয়।” (সূরা বাকারা: ২১৭)

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

“ইয়াহুদ-নাসারার কিছুতেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি (তোমার ধর্ম ছেড়ে) তাদের ধর্ম অনুসরণ করা।” (সূরা বাকারা: ১২০)

বাস্তব দুনিয়ায় এর দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই। এই আরাাকানের দিকেই তাকান। এই লোকগুলো কি খুব আল্লাহ ওয়ালা? ইসলামের জন্য কি নিবেদিত প্রাণ? কিছুই তো নয়। এরপরও কেন তাদের উপর এই নির্মম নির্যাতন? কারণ একটাই, যা আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

“আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনা ছাড়া এদের শাস্তি দেয়ার আর কোন কারণই ছিল না।”

অতএব, উহে মুসলামন! তোমরা কাফেরদের যতই মান্য করে চল, যতই ছাড় দিয়ে যাও- তাদের দুশমনি বন্ধ হবে না।

অনেক বিশেষজ্ঞ বলে বেড়ায়- ইরাক আক্রমণের কারণ এই, আফগান আক্রমণের কারণ এই... যদি ইরাক এই না করতো তাহলে আক্রমণ হতো না, আফগান এই করলে আক্রমণ হতো না... ইত্যাদি।

এসব কিছুই নয়। আসল কারণ- ঈমান। এই ঈমানের কারণে যুগে যুগে কাফেররা মুমিনদের দুশমনি করে এসেছে।

এই দুশমনকে প্রতিহত করার পদ্ধতি একটাই, যা আল্লাহ তাআলা বাতলিয়েছেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন-আনুগত্য পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” (আনফাল: ৩৯)

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَأَبَّوْا وَآقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কয়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (তাওবা: ৫)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

صَاغِرُونَ

“তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।” (তাওবা: ২৯)

হে আল্লাহ! আমাদের সহীহ বুঝ দান কর। আমাদের নুসরত কর। তোমার পথে আমাদের অটল অবিচল রাখ। আমীন!

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৪০৩>

কেন আমি জঙ্গী?

[mujahid](#)

Senior Member

০৫-১৪-২০১৭

কেন আমি জঙ্গী?

আমার আল্লাহ হলেন জঙ্গী*তাই তিনি আমার সঙ্গী,
তাই আমি ...জঙ্গী..!
তিনি বলেন কোর—আনে*তুমি করনি নিষ্কেপ,
নিশ্চই করেছি যে আমি,
তাই তিনি মোদের সঙ্গী*আর মোরা আজ জঙ্গী!
তাই রবো সারা জীবন*তিনার পথের পথ চারী.....
এই পথপানে ছিলেন রাসূল*ছিলেন সাহাবার দল,
তাই এই পথপানে চলে মোরা*করে যায় জিহাদের বল,
তাই তারা মোদের সঙ্গী*আর মোরা আজও জঙ্গী!
তাই রবো সারা জীবন তাদের পথের অনুগামী
হে আমার ভাই! তুমি কি হবে মোর সঙ্গী?
মোরা একসাথে রবো*চিরদিন হয়ে জঙ্গী,
হে যুবক এসো বায়াহ দেয় আলকায়দার শানে,
যে বায়াহ দিয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম বাবলা গাছের তরে ,
হয়ত শাহাদাহ নয়ত শরিয়াহ সবার ছিল কাজ,
তাই আমরাও পরেছি আল্লাহর জন্য, দীন প্রতিষ্ঠার সাজ!
তাই তো মোরা আজ জঙ্গী !
তাই তোমাকে বলছি তুমি কি হবে, আল্লাহর তরবারী?
তুমি কি হবে রাসূলের সঙ্গী,
তুমি কি আজও হবেনা আমাদের সাথে জঙ্গী?

আখি মুজাহিদ

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৭৫৫>